সম্পাদক
ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

নির্বাহী সম্পাদক
শ্রীজগদীশ দেবনাথ

সম্পাদনা সহযোগী
শ্রীতাপসকুমার রায়
tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ঢাকা কার্যালয়
১৪০/১ শাঁখারী বাজার
ঢাকা-১১০০।

চট্টগ্রাম কার্যালয়
২৭ দেওয়ান্‌জী পুকুর লেন
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০৩১-২৮৬০৭১১
মোবাইল: ০১৭১৪-৩১০২০৩
০১৮১৯-৩১২৫১৮

প্রধান কার্যালয়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
হিমাইতপুর-পাবনা
ফোনঃ ০৭৩১-৬৫৫২৩, ৬৫১৬৪
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৫৩৪২০৭ (সম্পাদক)
০১৯১১-৭৮৮১৩৯ (সম্পাদনা সহযোগী)
০১৭১৮-১৫২৩৪৪ (অফিস)
E-mail: satsanghimaitpur@yahoo.com

বাণিজ্যিক যোগাযোগ
শ্রীঅনিশচন্দ্র ঢালী
০১৭১৯-৭৫৩৪৭৪

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা
আমিনুল ইসলাম
প্রিন্ট মিডিয়া, প্রেসপট্টি, বগুড়া

সন্দীপনা

ই ষ্ট বা র্তা বা হী সা হি ত্য - মা সি ক

৪৩বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি '১৭ খ্রিঃ, শ্রীঅনুকূলাব্দ ১২৯

তোমার শত্রুকেও শত্রু ক'রে রেখে
সুখী হ'তে যেও না,
অসৎ-নিরোধী সুতৎপর প্রস্তুতি নিয়ে
যথাবিহিত শুভ সন্তর্পণায়
যতটা পার
তা'কে তোমার প্রীতি-বিকিরণায়
উদ্ভাসিত হ'তে দিও–
দক্ষকুশল তৎপরতায়;
মনে রেখো–তা' যেন আবার
তোমাকে বিপরীতভাবে
বিদ্ধ না ক'রে তোলে,
চেষ্টা ও চর্য্যার
ইষ্টার্থ-নিয়ন্ত্রণী অনুবেদনায়
তুমি অমনতর হ'তেই
যত্নশীল থেকো,–
আঘাতের কুঞ্চিত ক্রুরতা এড়িয়ে
তুমি অনেকখানি প্রস্বস্তি লাভ ক'রবে। (সদ্‌বিধায়না-১৩৩)

–শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

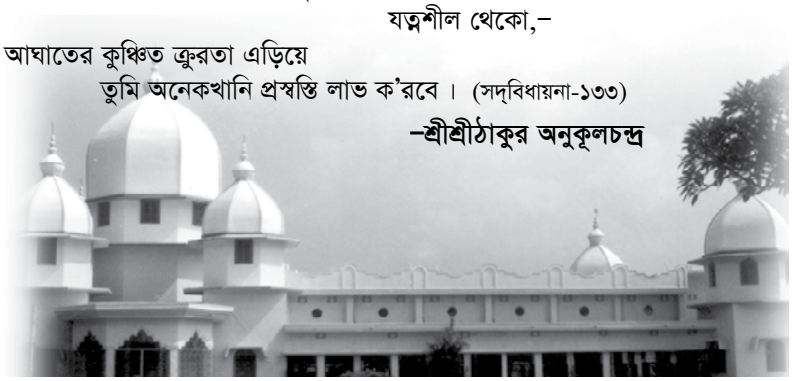

সূচিপত্র

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ৪
দিব্যবাণী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৭
মাতৃদীপনা- সেবা-বিধায়না ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১০
ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩
দেখা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫
আমি তোমাকে ভালোবাসি ঃ জগদীশ দেবনাথ ১৭
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও পুণ্যতীর্থ পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম ঃ
ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত ২০
শিশুর জন্ম ও সংস্কার ঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৩
প্রেমল ঠাকুর ঃ প্রলয় মজুমদার ২৬
শ্রীশ্রীঠাকুর ও আধ্যাত্মিকতাঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৯
মানসতীর্থ পরিক্রমা ঃ সুশীল চন্দ্র বসু ৩১
চিরঞ্জীব বনৌষধী–হিলমোচিকাঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ৩৭
যে ফুল শোভা না ছড়িয়ে ঝড়েছে ধরণীতে ঃ শ্রীঅর্ণিবান দেবনাথ ৩৯
প্রার্থনার সময়সূচি ৪০

অনলাইনে 'সন্দীপনা' পড়তে ভিজিট করুন–
www. srisrithakuranukulchandrasatsang.com/pages/publications

সম্পাদকীয়

সেদিন এক কার্ত্তিকের ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বগতোক্তি করলেন– 'সুযোগ হ'লেই ভলো হয় ।' বেশ কিছুদিন তিনি বড়াল বাংলোর ভেতরেই থাকতেন । শরীরটা ভালো থাকছিল না । তাই পূজ্যপাদ বড়দার নির্দেশে তাঁর সুস্থতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা ১৯৬৭ সাল । হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের যুদ্ধশেষে সীমান্তপথে চলাফেরা বিঘ্নিত ।

ব্যক্তিজীবনে আমি বি.এস. সি পাস করে যশোহর ছাতিয়ানতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষক । পূজোর ছুটিতেই সুযোগ বুঝে আমার দেওঘর গমন । এ দিনই তিনি কোলাবসেব্ল গেট পেরিয়ে উন্মুক্ত অঙ্গনের বিশাল চৌকিতে শুভ-শয্যায় অবস্থান করছেন । জনাদুয়েক মা তাঁর সেবা-পরিচর্যায় সহায়িকা । আশপাশে তেমন খুব বেশী কেউ নেই । চারপাশে কাঠের পাটাতোন । এপার থেকেই মৃদুল আলোয় তাঁর জ্যোতির্ময় দিব্যতনু দর্শনে আমি পুলকিত, রোমাঞ্চিত । সেবানিরতা একজন মা জিজ্ঞাসা করলেন–

'বাবা, কী বল্লেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন–'সু-যোগ হ'লেই ভাল হয় ।'

তাই বল্লাম ।' উঁচু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তিনি একটু কাত হলেন । কমল-চরণ দুটি সু-প্রসারিত । উজ্জ্বল আলোর আভাস প্রভাতের সোনালি সূর্যের আভাস । আমি আমার ডায়রিতে লিখে রাখলাম–

'সু-যোগ হ'লেই ভাল হয় ।'

পরিবেশের প্রেক্ষিতে চুরি ক'রে ভারত পেরিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে জন্মস্থানে ফিরে আসা তাঁর স্বগতোক্তি– 'সু-যোগ হ'লেই ভাল হয়'– আমাকে তাড়িত করে' সু-যোগ মানে কী? 'যোগ' শব্দাটিই প্রথমে দেখি ।

'যাগ'–ব্যাকরণ সূত্রে যুজ্ ধাতুর সাথে 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হ'লে 'যোগ' শব্দাট নিষ্পন্ন হয় । অভিধান এই শব্দটির সমার্থক শব্দ দিয়েছে অনেকগুলি–যুক্ত, সমাগম, সমবায়, সম্বন্ধ, প্রয়োগ, যত্ন, চেষ্টা, প্রাপ্তি, লাভ । যোগ মানে বাক্যস্থ পদসমূহের একীকরণ । গণিতশাস্ত্রে যোগ মানে । জ্যোতিষ শাস্ত্রে যোগ মানে গ্রহ-নক্ষত্র সমূহের বিশেষ সম্বন্ধ ।

পৌষ পেরুলেই মাঘ । ভারতীয় পঞ্জিকামতে– যে চান্দ্রমাসে সাধারণত মঘানক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়–তাকে চান্দ্র মাঘ বলে । সূর্যের মকর রাশির স্থিতিকালেই তার সম্ভাবনা । শীত-ঋতুর অন্তর্গত এই মাঘ বঙ্গাব্দের দশম মাস । সনাতনী বঙ্গীয় রীতিতে সংস্কার কর্মের সংকল্প বাক্যে বলতে হয়–

মাঘে মাসি মকররাশীস্তে ভাস্করে । সূর্যের আর এক নাম ভাস্কর । সূর্য যখন মাঘ মাসে মকর রাশিতে অবস্থান করছেন সেই সময়ে এই ঋতু-সংকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ-বর্ণ বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য । কখনই তিনি কোনও অসংলগ্ন কথা বলেননি । সেদিনে আমার ডায়রিতে লিখে রাখা কথা-সূত্রে তাঁরই ইংরাজী বাণী গ্রন্থ–'MAGNA-DICTA '-এর ১৪০ সংখ্যক বাণীটির প্রতি মনোযোগী হলাম । শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন–

'Diary is the dairy
of experence.'

পরম-প্রভুর এই ছোট ইংরেজী বাণীটিকে বাংলা রূপ দিতে গিয়ে আমি লিখি–
দিন-লিপি যেন এক দুগ্ধ-খামার,
–জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার,
ঠিক পরের বাণীটি –সংখ্যা-১৪১

'Glow of charecter
glows the temperment
of the environment.'

আজ সমগ্র পৃথিবী পরিবেশ-দুষ্ট। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আতঙ্কিত। আমাদের ছোট দেশ বাংলাদেশ–এর রাজধানীতে বুড়িগঙ্গার কালো জল দুগর্ন্ধের শ্বাস-নিরোধ পরিবেশ আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী তখন–সবকিছুর মূলে ব্যক্তিজীবনের সুস্থ্য-সুন্দর মাঙ্গলিক চারিত্রিক দীপ্তি Glow of charecter যথার্থ সু চারিত্রিক-দীপনা। দেশ-সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করেও তুলুক,
'দীপ্তি'-চরিত্রের–
দীপ্ত করে প্রকৃতিটা
–সে পরিবেশের।
–বন্দে পুরুষোত্তমম্।

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতাঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; এম এ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

শ্রীশ্রীঠাকুর– না-হওয়ার জন্য চেষ্টা করা লাগে, তবু কিছু এসে পড়ে। অনেকের congelital proneness to disease (জন্মগত রোগ প্রবণতা) থাকে, আবার পরিবেশ থেকে নানা রোগ আসে। আচার-আচরণ ও আহার থেকে নানা বিপত্তি ঘটে। মানসিক দৃষ্টি থেকে আবার শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। তাই, রোগবালাই এড়াতে গেলে অনেক দিক্ সামাল দিতে হয়। ফলকথা, Idel (ইষ্ট), individual (ব্যাষ্টি) ও environment (পরিবেশ)–এই তিনের concordance (সঙ্গতিতেই) জীবন। তাই, নিজে ইষ্টানুগ নিখুঁত চলনায় চ'লে শারীরিক, মানসিক ও কায়িক সুস্থতা অর্জ্জন করতে হয়। আবার নিজের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশকে যদি অমন সুস্থ ক'রে তোলা না যায় তবে কিন্তু একলা সুস্থ থাকা যাবে না। .....মৃত্যুকেও অতিক্রম করা না যায়, তা' নয় ; আবার, মরণও মরণ না, যদি স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করা যায়। তবে, আয়ু যে প্রভূত পরিমাণে বাড়ান যেতে পারে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় যদি ঘটে, তবে আয়ু বহুল পরিমাণে বাড়ান যেতে পারে। মৃত্যুর চিন্তাই আমাদের মৃত্যুর মধ্যে নিয়ে যায়। এমন প্রীতিমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, যাতে মানুষ মৃত্যুর কথা ভাবতেই ভুলে যায়।

কেষ্টদা– কিন্তু মৃত্যু তো অনিবার্য্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর–অনিবার্য্য যা', তা' যে চিরকালই অনিবার্য্য থাকবে– তা' যে নিবার্য্য হবে না, তার মানে কী? মৃত্যু অনিবার্য্য হ'লেও মৃত্যুকে আমরা চাই না। যা' চাই না, তার ধ্যান ক'রে তাকে টেনে আনতে যাব কেন?

চারিদিকে আঁধার ঘিরে আসলো, বাইরে ঠাণ্ডাও লাগছে বেশ। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় এসে বসলেন। কাল থেকে ৩১তম ঋত্বিক্-অধিবেশন আরম্ভ।

বাইরে থেকে দাদারা অনেকে এসেছেন। তাঁদের কতিপয় এসে বসলেন। যথা রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), পাঁচুদা (গাঙ্গুলী), যুগলদা (রায়), মণীন্দ্র ভাই (কর) ইত্যাদি।

সতুদা (সান্যাল) তাঁর এক আত্মীয় সহ এসেছেন। তিনি কথাচ্ছলে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। ঘটনাটি এই এক ভদ্রলোক ট্রেনে অযথা মহাত্মাজীর নিন্দা ক'রে সকলকে চটিয়ে তুলছিলেন। এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন–

'বড়র যারা নিন্দা করে
ছোটই তারা অন্তরে,
নরকদেশে চলন তাদের
কোন্ অজানা কন্দরে।'

তারপর বললেন, এমন অনেকে আছে, যারা বড়লোক দেখলেই নিন্দা না ক'রে পারে না। কোন মানুষকে বহু লোক শ্রদ্ধা করে, অনুসরণ করে, সুখ্যাতি করে–এ দেখলেই তাদের যেন অসহ্য লাগে, তাদের inferiority (হীনম্মন্যতা) গোঙরায়ে ওঠে তখন। খামাকা ভাবে, তারা ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। তাদের inferiority (হীনম্মন্যতা) তখন groaning (গোঙরান) রকমে চলে তাঁকে down (খাটো) করার জন্য। নিন্দা আর criticism (সমালোচনা) কিন্তু আলাদা। criticism (সমালোচনা)-এর মধ্যে যুক্তিও থাকে, balance (সাম্য)-ও থাকে, খাটো করার বুদ্ধি থাকে না। নীতির ব্যত্যয় যেখানে যত থাকে, সেটাকে তুলে ধরার বুদ্ধি থাকে। গুণ, অবগুণ–দুইয়েরই উল্লেখ থাকে তাতে। খাঁটি সমালোচনা করতে পারে খুব কম লোকই। নিজের একটা নিখুঁত দাঁড়া বা আদর্শ না থাকলে তা' মানুষ পারে না। নিন্দার উত্তর দিতেও আবার সকলে জানে না। এমন করে নিন্দার উত্তর দেওয়া যায় যে তাতে মানুষের মাথা একেবারে সাফ হয়ে যায়। যে complex (প্রবৃত্তি)-কে চেনে, তার কাছে জারিজুরি খাটে না, তার কাছে মুশকিল আছে। সে একজনকে তার নিজের কথা দিয়েই কাত ক'রে ফেলে। এ একরকম যুযুৎসু খেলার মতন। তবে নিজে চ'টে গেলে মুশকিল। complex (প্রবৃত্তি)-এর উপর mastery (আধিপত্য) যার আছে, সে মানুষকে রকমারিভাবে খেলিয়ে-খেলিয়ে কায়দামত জায়গায় আনতে পারে।

সতুদা– যেখানে গরম হওয়া দরকার, সেখানে গরম হবে, কিন্তু গরম হওয়া, নরম হওয়া, সবটার উপরেই তোমার অবাধ অধিকার চাই। গরম হ'তে পার, নরম হ'তে পার না ; নরম হ'তে পার, গরম হ'তে পার না– এমন হলে হবে না।

নটের মতো ভাবসিদ্ধ হ'তে হবে। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে যে-মুহূর্ত্তে যেমন প্রয়োজন সে-মুহূর্ত্তে তেমন করতে হবে। তোমার মূল লক্ষ্য থাকবে মানুষটাকে ভালোর দিকে আকৃষ্ট করা, কারণ, মানুষ চায়ই যে ভাল। যারা গাঁজা খায়, তারাও গাঁজেল নামে পরিচিত হ'তে চায় না।

সতুদা– যে গাঁজা খেয়ে frankly (খোলাখুলিভাবে) স্বীকার করে এবং frankness (স্পষ্টবাদিতা)-এর বড়াই ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–সেটা frankness (স্পষ্টভাষণ) নয়, vanity (অহঙ্কার)। গাঁজা ছাড়বে না weakness (দুর্ব্বলতা)-এর দরুণ, তবু সেটাকে support (সমর্থন) করতে চায়, যেন সেটা কত ভালো কাজ–এমন pose (ভাঁওতা) নিয়ে সে তার frankness (দুর্ব্বলতা) ও inferiority (হীনম্মন্যতা) ঢাকতে চায়। মজা এমনি, তাকে যদি পাঁচজনে গাঁজেল বলে, তাহলে সে কিন্তু চ'টে যাবে। তাকে যদি মানুষ ভালো বলে, তবে কিন্তু সে দুঃখিত হবে না। যে-মানুষ যতই খারাপ হোক, ভালো হওয়ার লোভ প্রত্যেকেরই আছে অন্তরে-অন্তরে। পারে না নিজের obsession (অনুভূতি)-এর দরুণ। ..... যা হো'ক, যে নিজের গাঁজা খাওয়ার কথা স্বীকার ক'রে এবং সঙ্গে-সঙ্গে গাঁজা ছেড়ে দেওয়ার পথ দেখে, তাকে বলতে পার (অকপট), তার ঐ বলার মধ্যে থাকে অনুতাপ, আত্মসমর্থনের ভাব থাকে না। তার ঐ বলায় অন্যে বরং উপকৃত হয়, নয়তো আত্মসমর্থনী ধাঁজের বলায় অন্যের প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর গুঞ্জার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে আদরের সুরে বললেন–আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি!

গুঞ্জা হাসতে লাগল।

ওর গায়ে একটা জামা ছিল কিন্তু তেমন পুরু নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে বললেন, ওর শীত লাগছে না তো?

বিদ্যামা বললেন– না।

শ্রীশ্রীঠাকুর– আমরা ছোট বেলায় দোলাই গায় দিতাম। জামাজুমি যতই কও, ওতে কিন্তু খুব শীত রাখত। আজকাল কায়দা কেতা খুব বাড়তেছে, কিন্তু মানুষের সুখ বাড়তিছে কি না কওয়া মুশকিল।

অতুলদা জিজ্ঞাসা করলেন– ইংরাজীতে একটা কথা আছে– তার মানে হ'চ্ছে, পুরুষ-ছেলে যেখানে সব সময় বাড়ীতে থাকে, মেয়েরা সেখানে কখনো সুখী হ'তে পারে না। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর– সর্ব্বদা ঘরে থাকলে পুরুষ-ছেলের expansion (বিস্তার) ক'মে যায়, খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে খুঁত ধরে, বক্ বক্ করে, তাতে মেয়েরা একটা resistance (বাধা) feel (বোধ) করে। মেয়েছেলে বেটাছেলেকে বড় করে পেতে চায়। তা' না পেলে তাদের মন খারাপ হ'য়ে যায়, নিজেদেরই ছোট বোধ করে; মনে করে, they are being deprived of their expansion (তারা বিস্তার থেকে বঞ্চিত হ'চ্ছে), কারণ, দুনিয়াটাকে মেয়েরা enjoy (উপভোগ) করতে চায় পুরুষছেলের মধ্যে দিয়ে। তা-ছাড়া, যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে পাওয়ার চেষ্টা থাকে। তা' না থাকলে কার মূল্য ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করা যায় না। ভালোবাসার জন নিয়েই যদি cheap (সস্তা) হ'য়ে যায়, তাকে পাওয়ার জন্য যদি চেষ্টা করতে না হয়, তবে পাওয়াটা enjoyable (উপভোগ্য) হয় না। যা' যত কম চেষ্টায় পাওয়া যায়, তা' তত কম উপভোগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর অতুলদাকে জিজ্ঞাসা করলেন– penicillin চিকিৎসা গ্রামে-গাঁয় যাতে হ'তে পারে তেমনতর experiment (পরীক্ষা) চলছে না?

অতুলদা–চাকরীতে আমাদেও কতটুকু স্বাধীনতা? যে-ভাবে যা' করতে বলবে সে ভাবে তা করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর– যাক, দরকার হ'লে আমরা এখানেই চেষ্টা করব।

এরপর নৈহাটির দুলালদা (নাথ) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন– আমেরিকানদের ফেলে-দেওয়া বোতল কেটে -কেটে আমরা সুন্দর গেলাস তৈরী করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহা-আগ্রহভরে বললেন– কই, দেখি!

দুলালদা এনে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে বললেন– বেশ হয়েছে! কত লোক এমন দেখে কিন্তু তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। ইষ্টানুপূরণের ধান্ধা থাকলে তার থেকে আসে proper observation and utilisation of things (বস্তুনিচয়ের পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যবহার)। ঐ ধান্ধা থেকে যে কত কিসের উদ্ভব হ'তে পারে তার কি ঠিক আছে?

অতুলদা– গাত্র-হরিদ্রার কী ফল?

শ্রীশ্রীঠাকুর– এটা হ'ল normal (স্বাভাবিক জীবাণুনাশক)। তা-ছাড়া চামড়াকে soft ও glazy (কোমল ও চকচকে) করে। দেখতে ভালো দেখা যায়, hygienic condition (স্বাস্থ্যের অবস্থা)-ও improve (উন্নত) করে। skin (চর্ম্ম) delighted (হৃষ্ট) হয়। মাস-কলাই ও হলুদ বেঁটে সরিষার তেলে মিশিয়ে গায়ে মেখে স্নান করলে রং খোলে, চামড়ার

একটা food (খাদ্য) হয়। মৃগ ও হলুদ একসঙ্গে বেঁটে বড়ি ক'রে খেলে হজম, গায়ের রং ও পুষ্টি ভালো হয়।

কথাচ্ছলে আরও বললেন–শুনেছি, মেয়েছেলে রোজ যদি একতোলা করে দুর্ব্বার রস মধু দিয়ে খায়, তাহ'লে সাধারণতঃ তার ছেলে-ছাড়া মেয়ে হয় না, স্বাস্থ্যও ভাল হয়। এটা আয়ুষ্কর। ..... আমি সবাইকে রোজ সকালবেলায় থানকুনি খেতে বলেছি। ও যে কত বড় ভালো জিনিষ, না খেলে বোঝা যায় না। থানকুনির এক নাম অমৃতা। নামের সঙ্গে কাজের সঙ্গে মিল আছে। অমৃতের মতই কাজ ক'রে। বড় nervine (রসায়ন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর অতুলদাকে বললেন– Bacteriologist (জীবাণুবিজ্ঞানী) একজন চাই। সব রকম পারে এমন একজন medical-man (চিকিৎসক) চাই, যেন কঠিন কিছু হ'লে কলকাতা দৌড়তে না হয়। বরং কলকাতা থেকে more sure (বেশী নিশ্চিত) হ'তে পারি।

অতুলদা– আপনি চান first class (প্রথম শ্রেণীর) লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর– First class ladder (প্রথম শ্রেণীর মই) না হ'লে first class height-এ (প্রথম শ্রেণীর উচ্চতায়) যাওয়া যায় না। সেই জাতের মানুষ চাই।

কেষ্টদা মাঝে কিছু সময় ছিলেন না, আবার ফিরে এলেন। অম্বুবাচীর সময় মাটি খোঁড়া হয় না কেন, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর– পৃথিবীটা যেন প্রকৃতি অর্থাৎ নারী আর অম্বুবাচী যেন তার ঋতুকাল। মেয়েদের প্রত্যেক মাসে একবার হয় আর পৃথিবীর হয় বছরে একবার। মেয়েদের ঐ সময় যেমন সাবধানে রাখে তেমনি মাটিকেও ঐ সময় সাবধানে রাখে। অম্বুবাচীর পর মাটির উর্ব্বরতা বেড়ে যায়, গাছ-লতা পাতা যেন তেজালো হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা– কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, জমির উর্ব্বরতা তিন প্রকারে বাড়ে।

প্রথমতঃ ,রাজার চেষ্টায়–যেমন irrigation-এ (জলসেচ ব্যবস্থায়), দ্বিতীয়তঃ, গ্রহের সঞ্চারে, তৃতীয়তঃ, বৃষ্টিতে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের খাবার-সময় হওয়ায় সবাই উঠে পড়লেন।

আহ্বান

ইষ্টপ্রাণেষু দাদা/ মা

রা-নন্দিত জয়গুরু। প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবারিত করুণায় পরমতীর্থধামে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন ঘটে। এছাড়া আশ্রমে নিয়মিত ভক্তবৃন্দ এবং অবস্থানরত ছাত্রগণের দৈনন্দিন আনন্দবাজারের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে সারাদেশে অবস্থিত ইষ্টপ্রাণ সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে পারেন। বছরের প্রতিদিনই অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই জনপ্রতি ১দিন কেন্দ্রীয় আশ্রমে আনন্দবাজারের প্রসাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংযোগ করলে আশ্রমের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটবে এবং দায়িত্ব গ্রহণকারীর প্রতিও পরমপিতার কল্যাণ অবারিত বর্ষিত হবে।

তাঁর এই করুণাধারায় মিলিত হবার জন্য সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিনয়াবনত–

সভাপতি
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

দিব্যবাণী
(বিধি-বিন্যাস)
–শ্রীশ্রীঠাকুর

চেয়ে-চেয়েই হয়রান হ'লে–
কিন্তু পেলে না কিছু,
আর, যা' পেলে
তা'তে তোমার অভাব মিটলো না,
তা'র মানে, তোমার ভাব-প্রতীক যিনি,
উৎসারণী অনুদীপনায়
তোমার প্রীতি-অবদান
তাঁকে ফুল্ল ক'রে তোলেনি,
তুমি তাঁ'র হওনি,
অর্থাৎ, তুমি তাঁ'র
একচেটে স্বার্থ হ'য়ে ওঠনি,
তাঁর স্বার্থই মুখ্য হ'য়ে ওঠেনি
তোমার জীবনে,
তোমার ব্যক্তিত্বকে স্বতঃ-উৎসারণায়
তাঁ'তে সার্থক হওয়ার প্রলোভনে
চয়ন-নিরত ক'রে তোলনি;
তাই, তাঁ'র কাছে থেকেও
তাঁ'র শত চেষ্টা সত্ত্বেও
তোমার প্রাপ্তি উচ্ছল হ'য়ে উঠছে না;
তাই, পেতেই যদি চাও,
দাও–
স্বতঃ-উৎসারণী তন্মুখী অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
তোমার চয়নী প্রচেষ্টার সাধ্যে যা' কুলায়
যেমনতর,
এই অবদান পাওয়াকে বাড়িয়ে তোলে;
অবশ্য প্রত্যাশাপীড়িত অবদান
অবদানই নয়কো,
তা' বরং বঞ্চনারই সঞ্চিত রৌরব ক্ষেত্র;
ঈশ্বর পরম-সার্থকতা,
তাঁ'তে আত্ম-বিনায়নী উৎসর্গ
স্বর্গেরই শুভ সংক্রমণ । ৭৬ ।

অন্যের স্বার্থ-সুবিধাকে
ক্রূর উপেক্ষায় উপেক্ষা ক'রে
বা নির্লজ্জ নিষ্পেষণে নির্য্যাতিত ক'রে
নিজের স্বার্থ-সুবিধাকে
যখন প্রবল ক'রে ধর,
আর, সেই প্রচেষ্টায়
অন্যকে ব্যাহত ক'রতেও কুণ্ঠিত হও না,–
তখনই তুমি স্বার্থ-সঙ্কুচিত,
আত্মস্বার্থপ্রলুব্ধ তুমি তখন;
প্রতিক্রিয়ায়
তোমার স্বার্থ-নিষ্পেষণ
অনতিবিলম্বেই
ক্রূর পরিহাস নিয়ে
তোমার সামনে উপস্থিত হবে;
তাই, পরার্থ-পরিষেবনাকে উদাত্ত ক'রে নিয়ে
তা'রই প্রসাদ-স্বরূপ
তা' হ'তে আত্মপুষ্টি আহরণ কর,–
বিধাতার আশীর্ব্বাদ
তোমাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে,
আবার, উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণতাবিহীন
পরার্থপরতা
তোমাকে সঙ্গতিহারা ছন্নকর্ম্মাই ক'রে
তুলবে কিন্তু । ৭৭ ।

যথেষ্ট পেয়েও
আরোর প্রত্যাশায়
বা ঈর্ষ্যা-পরায়ণতায়
তোমার পালয়িতার প্রতি
যতই তুমি হিংসাবিমূঢ় হ'য়ে উঠবে,
দ্বেষ-পরবশ হ'য়ে উঠবে,
ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
হিংস্র কটাক্ষে বা ক্রিয়ায়
সংবিদ্ধ ক'রে তুলবে তা'কে,
নিজের স্বার্থসেবায়
তা'র অপচয় সংঘটন ক'রতে
কুণ্ঠিত হবে না,–
মনে রেখো–
তোমার ঐ অন্তর
লুব্ধ ক্ষিপ্ততায়
ফেনিল গর্জ্জনে
দুর্দ্দশাকে
এমনভাবেই আকর্ষণ ক'রছে যে,
দুর্দ্দশা তোমাকে
দারিদ্র-ধুক্ষাপীড়িত ক'রে
জাহান্নাম শেষ সমাধি রচনা ক'রতে
এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না । ৭৮ ।

তুমি যা' পেলে
তা'তে দিনও চ'লছে তোমার,
যা' পেয়েছ
তা'ও তাঁ'রই অনুগ্রহের উদাত্ত অবদান;

এই পেয়ে চলার
যে-অবদানের ভিতর-দিয়ে
তুমি প্রাণন-প্রদীপ্ত হ'য়ে চল,
ঐ প্রাণন-সম্বেগ যদি
যাঁ' হ'তে পেয়েছ,
তাঁ'র প্রতি প্রীতি-অর্ঘ্য-মণ্ডিত হয়,
পরিবেশ-সহ তাঁ'র
পাওয়া ও চলার দায়িত্বে
তুমি নিজেকে বাস্তবভাবে
নিয়োজিত কর যদি,
তবেই ঐ অবদান উচ্ছল ও যোগ্য
ক'রে তুলবে তোমাকে,
তবেই সার্থক হবে ঐ অবদান;
আর, ঐ অনুচর্য্যায়
নিজেকে যদি কৃতার্থ না ক'রে তোল,
তবে বুঝো–
চৌর্য্যবৃত্তি তোমাকে পেয়ে ব'সেছে,
তা'র মানে হ'চ্ছে–
তোমার পাওয়ার উৎসকে অবজ্ঞা ক'রে
তুমি আত্মপোষণ-পরিচর্য্যাকেই
অবদলিত ক'রছ;
তাই, মানুষ প্রীতি-প্রবৃত্তি নিয়ে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবে না–
ঐ অমনতর অনুচর্য্যী অঞ্জলি নিয়ে;
ঐ চৌর্য্য-বৃত্তি কিন্তু
জাহান্নামেরই ক্রূর আহ্বান। ৭৯।

পেলেই স্ফূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো,
আর, যে-মুহূর্ত্তে তা' খরচ হ'য়ে গেল,
অমনি শুকিয়ে গেল তা',
–এটা হ'চ্ছে সেই লক্ষণ
যা'তে
তোমাকে অবশ ক'রে রাখছে,
করার প্রেরণা
বোধি-বিনায়িত হ'য়ে
সুসঙ্গত দর্শিতা নিয়ে
তোমার অন্তরে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে না;
তা'র মানেই হচ্ছে–
যোগ্যতা-প্রসূত প্রাপ্তি
তোমার কাছে
দুরধিগম্য হ'য়ে রইল;
আর, যখনই দেখছ–
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
স্ফূর্ত্তিতে বোধি-বিনায়িত তৎপরতায়
ফুল্ল হ'য়ে উঠেছে,
সার্থক সঙ্গতিতে
বোধি-অনুদীপনায়
এমনতরই অনুপ্রেরণা জুটে আসছে যে,
তা'তে মুগ্ধ হ'য়ে উঠছে অনেকেই,
এবং তা'দের ভিতরও
ঐ প্রেরণা চারিয়ে যাচ্ছে,
এ অনুশীলনপ্রবণ যোগ্যতা
এমন জেল্লা নিয়েই
তোমার কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে–
যা'র ফলে প্রাপ্তি তোমাতে নতজানু হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ না ক'রেই পারছে না–
তখনই বুঝবে
প্রাপ্তি তোমার করতলগত;
আর, তখনই তুমি
স্বতঃ-স্বচ্ছল সার্থকতায়
বিদীপ্ত হ'য়ে চ'লবে–
ফুল্ল অভিদীপনায়;
যে পারে–
তা'র এমনই লক্ষণ,
আর, যে পারে না,
তা'র স্ফূর্ত্তি
মূঢ়ত্বেই মুমূর্ষু হ'য়ে
প্রেরণা-নিথর হ'য়ে
শুধুমাত্র কল্পনা-বিলাসিতায়
আবিষ্ট ক'রে তোলে তা'কে। ৮০।

চাইলেও এত, পেলেও কত,
তৃপ্তি-নন্দিত কখনও কি হয়েছ?
যা'র কাছে চা'চ্ছ,
যা'র কাছে পা'চ্ছ–
চেয়ে পেয়ে–
তা'র প্রতি প্রীতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে
তা'তে কতখানি অনুকম্পা-পরায়ণ হ'য়েছ–
তা' কি ভেবে দেখেছ কখনও?
এত চেয়ে, এত পেয়ে
তা'র স্বার্থে, তা'র সমর্থনায়
তোমার দৈনন্দিন জীবনে
তা'র পরিপোষণার জন্য,
তা'র পরিতৃপ্তির জন্য,
সন্তোষ ও সন্দীপনার জন্য,
তা'কে উপচয়ী ক'রবার জন্য
কোনো ধান্ধা কি তোমায় পেয়ে বসেছে কখনও?
যে নিজেকে বঞ্চিত ক'রেও
তোমার অস্তিত্বকে বজায় রেখে চ'লেছে,–
যা'র অবদানে স্বচ্ছলভাবেই হো'ক
কি সাধারণভাবেই হো'ক
চ'লছ তুমি,–
ঐ প্রত্যাশা হ'তে নিজেকে মুক্ত ক'রতে
না পারলেও,
সে শুকিয়ে না যায়,
বঞ্চিত না হয়–

এমনতর প্রচেষ্টায়
তুমি কি নিয়ত প্রচেষ্টাশীল হ'য়ে চ'লছে?
চেয়ে যদি না পাও,
আর, চাওয়া-অনুপাতিক পাওয়া যদি না হয়,
তুমি কি তা'র প্রতি বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ না?
ব্যাহত প্রত্যাশা–
ভাবেই হো'ক
বাক্যেই হো'ক
ব্যবহারেই হো'ক
তা'র প্রতি বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার
সৃষ্টি কি করে না?
তা' করেই–
প্রায়শঃই ক'রে থাকে,
অভিমান-ঔদ্ধত্য নিয়ে তা'কে
বাক্যেই হো'ক
ব্যবহারেই হো'ক,
বেদনাপ্লুত ক'রতে ছাড় কিন্তু কমই,–
তা' কেন?
তুমি চাও,
যা'র কাছে চাও,
তা'র সামর্থ্য-মাফিক তুমি পেয়েও থাক,
সে-পাওয়া তোমাকে
পরিতৃপ্ত ক'রতে পারে না,
বরং চাওয়া-অনুপাতিক পাওয়া না হ'লে
তা' তোমাকে বিক্ষুব্ধ, অভিমান-উদ্বেলিত
উদ্ধত-ব্যবহারী ক'রে তোলে,
কারণ, পাওয়াটাই তোমার স্বার্থ,
যা'র কাছে পা'চ্ছ
সে তোমার কেউই নয়;
তোমার চাওয়া ব্যাহত হ'লে
বা প্রাপ্তি-প্রত্যাশা ব্যর্থ হ'লে
ঐ না-পাওয়ায় যখনই তুমি স্তব্ধ হ'য়ে ওঠ,
তোমার অন্তরের তহবিল খুঁজে দেখবে–
সে তোমার কেউই নয়কো;
এই-যে চাওয়ার দাবী,
পাওয়ার মিতালি অভিনন্দনা–
তা' কেন?
তা'র অর্থ–
তা'কে শোষণ ক'রছ
আত্ম-তৃপ্তির চাহিদায়,–
এ ছাড়া আর কিছুই নয়;
ঐ যে তা'কে ব্যয়িত ক'রে
কত রকম ক'রে তা'কে
কত জনার প্রয়োজনের
আপূরণী ইন্ধন ক'রে দিয়েছ–
তা'–অন্যের কাছে নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়,
তা'র প্রতিষ্ঠার জন্য
নয়কো;
তা'র প্রতিষ্ঠা ও প্রস্বস্তির ধান্ধা
তোমাকে পেয়ে ব'সে
তোমাকে তদনুপাতিক পরিচালিত
না ক'রেই থাকতে পারছে না,
এমনতর কি হ'য়েছে?
যদি তা' না হ'য়ে থাকে–
তুমি কি বোধ না–
তোমার এই কৃতঘ্নতার সঞ্চয়,
এই ব্যবহারের অব্যক্ত অভিশাপ
তোমাকে জর্জ্জরিত ক'রে তোলবার জন্য
এগিয়ে আসছে?
তোমার পাওয়া ও পোষণীয়
মুহ্যমান হ'য়ে
যে অতি শীঘ্রই এলিয়ে পড়বে;
আর, এমনতর অবসর পাবে না–
যা'তে তুমি এই পাপকে
পরাভূত ক'রে
বিনায়িত তৎপরতায়
নিজের সক্রিয় বিন্যাসে
পোষণ-ক্ষুধা-পরিতৃপ্তির
কোনো ব্যবস্থা ক'রতে পার;
আবার, যদি কখনও কোনক্রমে
সে-ব্যবস্থা ক'রতে পার,
তোমার এই সঞ্চিত কৃতঘ্ন অনুবেদনা
তোমাকে লাখো প্রকারে
নন্দিত অভিঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে
এমনতর দশায় এনে পৌঁছাবেই কি পৌঁছাবে–
কুক্কুরের মতো এক মুষ্টি অন্ন
পাও কি না-পাও;
তাই বলি–
যে তোমার জন্য করে,
যে তোমার পোষণ জোগায়,
তা'র অনুচর্য্যায়
তা'র পোষণ-পরিরক্ষণায়
স্বতঃই আত্মনিয়োগ ক'রে
তা'কে উপচয়ী ক'রে
নিজের পোষণ-রক্ষণার ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখ;
নয়তো বঞ্চনা
কুটিল ভ্রূকুটিতে
তোমাকে লাঞ্ছিত ক'রে তুলবেই কি তুলবে;
তোমার স্বস্তিদায়ককে স্বস্তি দাও,
প্রস্বস্তি তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে;
ঈশ্বর কর্ম্মের, সক্রিয় সম্বেগ,
ঈশ্বর নিষ্পন্নতার প্রীতি-আত্মপ্রসাদ,
ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় যে যেমন–
ঈশ্বরও সেখানে তেমন,
ঈশ্বরই পরম প্রস্বস্তি। ৮১।

মাতৃদীপনা

(মায়েদের জন্য বিশেষ সাহিত্য আসর)

সেবা বিধায়না

–শ্রীশ্রীঠাকুর

অনেক সময় মানুষ প্রবৃত্তি-সঞ্জাত
আত্মম্ভরিতা নিয়ে চলে
লোকসেবার অছিলায়,
আর, তখনই দেখা যায় তা'তে
একটা লোভ-লেলিহান জেল্লা–
যা'র ফলে, লোকে মনে করে
সক্রিয় আপ্রাণ লোকসেবাব্রত নিয়েই
ইনি চ'লেছেন,
তা'র সাথে থাকে না
কথায়, কাজে, সেবা-ব্যবহারে একটা সঙ্গতি–
সত্তায় গেঁথে-ওঠা চরিত্র,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বালাই তা'তে নাই,
তাই, তা' ভঙ্গুর, বিক্ষিপ্ত
খেয়ালী খেলার অবিমৃষ্যকারী বিভ্রমণ মাত্র'
আসল যা'রা
তা'রা সবটার ভিতর-দিয়েই
আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে,
আদর্শ-পুরুষের বেদী-মূলে
লোকসেবা-নৈবেদ্য নিয়ে
তা'রা ঈশ্বরারাধনায় নিরত–তপঃপ্রাণ,
এই পার্থিব আবহাওয়ার ভিতরে অনুস্যূত
যে অমর আত্মিক মলয়হিল্লোল আছে–
অমর মূর্ত্তিতে তা'কে
চির-বিকিরণে
চিরন্তন ক'রে রেখেই চলে তা'রা । ১৪৭ ।

আপালিত, আপোষিত
বা আপূরিত হওয়ার প্রত্যাশায়
লুব্ধ হ'য়ে
যে বা যা'রা
স্বার্থান্ধ পরিকল্পনায়
শ্রেয়চর্য্যা নিয়ে থাকে,
তা'দের আত্ম-নিয়মনা
স্বার্থান্ধ অনুপ্রেরণাতেই
পর্য্যবসিত হ'য়ে
শ্রেয়কে অবজ্ঞা ক'রে
অর্থাৎ শ্রেয়-পোষণ-প্রদীপনাকে
দলিত ক'রে
শোষণ-বৃত্তির কুটিল তর্পণাতেই
প্রযুক্ত হ'য়ে চলে;
ফলে, তা'দের বোধ
শ্রেয়ানুরঞ্জনা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে ব্যর্থ ও বিপন্ন ক'রেই চলে;
তাই, সেবাবিমুখ, সহজ-জ্ঞানহারা, কুটিল
স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতাই
হয় তা'দের ব্যক্তিত্বের পরিণতি । ১৪৮ ।

যখনই দেখছ
তোমার আপদে-বিপদে, দুঃখে-দুর্দ্দশায়
অপমানে-পীড়নে
কেউ সহানুভূতিপ্রবণ হ'য়ে
সসঙ্গতি তোমার
ঐ দুর্ভোগ-নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
সক্রিয় সহানুভূতির আবেগোচ্ছল সন্দীপনা নিয়ে
পারস্পরিক স্বতঃ-সন্দীপনায় সম্বন্ধ হ'য়ে
তোমাকে আগলে ধ'রছে না,
বা তুমিও কাউকে অমনতর ক'রছ না,–
তখনই বুঝো–
তোমরা আদর্শবিহীন, অসংগত,
দৃপ্ত হৃদয়-সম্বেগ নিয়ে
ইষ্টনিবদ্ধ নওকো,
সঙ্ঘ, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রের প্রতি
প্রাণস্পর্শী আবেগদীপ্ত প্রীতির
কথঞ্চিৎও নেইকো তোমাদের,
তাই, লোকপ্রাণতাও নেই,
দুর্ব্বিপাকের ইন্ধন ছাড়া
তোমরা আর কিছুই নওকো,
অন্যের খাদ্য ও পদলেহী হওয়ার গর্ব্বেল্সা ছাড়া

প্রাণবন্ত সম্বল কিছু নাই–
যা' সংহতিতে সন্দীপ্ত হ'য়ে
শক্তিতে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
স্বাধীন তোমরা কিছুতেই নও,
স্বচ্ছন্দ-চলন
তোমাদের কাছে রূপকথা মাত্র,
সক্রিয় সহানুভূতি-সম্পন্ন সম্বন্ধে
সুবদ্ধ কেউই নও তোমরা,
ক্ষোভ ও আপশোস্ নিয়ে
অযথা অন্যায্যভাবে
অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হ'য়ে
জীবন-ধারণ করাই
তোমারদের অর্জ্জিত কর্ম্মের ভাগ্যলেখা,
যতক্ষণ সামলে না দাঁড়াবে–
এ বিদ্রূপ
তোমাদিগকে রেহাই দেবে না কিছুতেই,
এখনও সাবধান হও। ১৪৯।

মানুষের অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্টে
শুধুমাত্র অলস নজরেই
তাকিয়ে থেকো না–
তড়িতী সতর্কতায়
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
দেখ-বোঝ-ভাব,
নিরাকরণ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ
সক্রিয়, সানুকম্পী দায়িত্ব নিয়ে–
ঐ দুর্দ্দশা বা কষ্টের লাঘব
কত সত্বর কেমন ক'রে ক'রতে পার
সেই চেষ্টায়,
অলস নজরে তাকিয়ে থাকা
বা নিরর্থক আপশোস্-বুলি আওড়ান
নিরাকরণবুদ্ধিকে হতভম্ব ক'রে তোলে,
আর, উপস্থিতবুদ্ধিকেও অসাড় ক'রে তোলে,
একটা অমানুষিক প্রাজ্ঞতায়
তা'কে অবশ হ'য়ে চ'লতে হয়;
ইষ্টানুগ, সানুকম্পী, সচেষ্ট,
দায়িত্বশীল, নিরাকরণী
সেবা-অভ্যস্ততাই
মানুষকে জ্ঞানদীপ্ত ক'রে তোলে,
অন্যের প্রতি অলস অনুকম্পায়
নিজেকে অসাড় ক'রে তুলো' না। ১৫০।

অন্যের আপদ-বিপদ-দুর্দ্দশাকে উপেক্ষা ক'রে
নিজের নিরাপত্তা নিয়ে
ব্যস্ত থাকলে যখনই–
বুদ্ধি-কৌশল, শক্তি-সামর্থ্য, অর্থ
ও জন-সংগ্রহ তোমার সামর্থ্য-মত
যতটা সম্ভব তা' দিয়ে
বিপুল পরাক্রমে
তা' নিরোধ ক'রলে না যে মুহূর্ত্তেই–
ঠিক জেনো, সে মুহূর্ত্তেই
তোমার দুর্দ্দশাকে আমন্ত্রণ ক'রে রাখলে,
সে যে-কোন মুহূর্ত্তেই
তোমার দরজায় হানা দিয়ে
সর্ব্বনাশ ক'রবে তোমার,
তাই, অন্যের দুর্দ্দশাকে
কখনও উপেক্ষা ক'রো না,
তোমার সামর্থ্যে যা' জোটে
বুদ্ধি-বিবেচনায় যা' আসে–
তা'ই দিয়ে তা' নিরোধ ক'রো,–
স্বস্তির পথ মুক্ত থাকবে। ১৫১।

যা'কেই কোন রকমে বিব্রত দেখছ,
বা যে নিজের চ'লবার দোষেই
বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছে,
তা'কে ফেলে যেও না;
বুঝো–
ঐ বিবৃতি-বিতাড়নই তোমার সত্তাধর্ম্ম,
যত পার–
যেমন ক'রে পার–
শুভ নন্দনায়
সে যা'তে ঐ বিবৃতি হ'তে রেহাই পায়,
দরদী অনুবেদনী অনুচর্য্যায়
তেমনভাবে মুক্ত ক'রে তোল তা'কে–
সতর্ক স্বস্তি-প্রসন্ন তৎপরতায়;
এই মুক্ত ক'রবার অনুচর্য্যাই তোমাকে
ক্রমশঃই মুক্ত ক'রে তুলতে থাকবে–
বোধি-ব্যক্তিত্বের মূর্ত্ত যাগ-গরিমায়,
যোগ্যতার জিতি-অনুচলনে;
ঈশ্বর মুক্তির উন্মুক্ত আশ্রয়
ধারণ-পালনী পরম উৎস। ১৫২।

ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো

(অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

ধরা-ছাড়া নিকেশ ক'রে
প্রেষ্ঠে তুমি আগ্‌লে ধ'রে
সব থাকা, সব যাওয়া নিয়ে
তাঁ'র চলনে নাই চল–
তাঁ'র যা'-কিছু গুণান্বয়ে
বোধ-প্রবৃত্তির সমুচ্চয়ে
বুক ফুলিয়ে উচ্ছলতায়
চ'লবে কেমন কিসে বল?
রিক্ত হ'য়ে, সিক্ত হ'য়ে
অন্তরেতে ধ'রে-ব'য়ে
বিচ্ছুরণী সার্থকতায়
তবে তো জীবন সার্থক হ'ল!
বোধ-প্রবোধের অভ্যুদয়ে
সার্থকতার ঋতান্বয়ে
ধরা-ছোঁওয়া স'য়ে-ব'য়ে
তা'তেই জীবন ধন্য হ'ল। ৮৪।

পুণ্যপ্রতুল কুলগৌরবে যে
শ্রেষ্ঠে করে আত্মদান,
সেবা-সৌকর্য্য স্বার্থ ই যা'র–
জীবনচর্য্যা প্রণিধান;
শ্রেষ্ঠ তা'রা হ'য়েই থাকে
প্রকৃতিরই অমোঘ ডাকে,
তৃপ্ত ক'রে, দীপ্ত ক'রে
নিষ্ঠাপ্রতুল ক'রে সবাকে। ৮৫।

প্রিয়র জীবন বেসে ভাল
ভরলি না তোর কুটিল বুক,
লাখ সেবা তোর আরতি করুক
পাবি কি তুই একটু সুখ? ৮৬।

চ'টে যখন আগুন হ'লে
লোভে হ'লে মুহ্যমান,
ইষ্টপ্রবণ তবুও থাকলে
তবেই আছে ইষ্টটান। ৮৭।

নেশার চোটে আত্মহারা
সে মত্ততা কোথায় ভাল?–
সেবামুখর ইষ্টনেশা
সব নেশারই দ্যোতন-আলো। ৮৮।

যা'কে তুমি ব'লছ প্রিয়
তাঁ'র তিরস্কার, গঞ্জনা,
তাড়ন-পীড়ন যা' করেন তা'তে
প্রীতি তোমার ধ্বসেই না;
অন্তর-বাহির সবটা দিয়ে
ব'লো তা'কে তখন 'প্রিয়',
সত্তাটাকে অর্ঘ্য দিয়ে
অন্তর-বাইরে সার্থক হ'য়ো,
ঐ প্রীতিই তো অটুট নিষ্ঠায়
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে
সার্থকতা উথ্‌লে তোলে,
করে মহৎ হৃদয় দিয়ে,
অন্তরেরও অনুভূতি
ব্যবহার সহ কৃতি,
শ্রদ্ধাসিদ্ধ ক'রে তোমায়
বাড়িয়ে দেবে বিভন-ধৃতি;
জপ-সাধনা তপশ্চর্য্যা
যেমনতরই কর তুমি,
তা'রই স্থণ্ডিল ঐ তো প্রিয়,
সার্থক হ' তাঁ'র চরণ চুমি'। ৮৯।

ইষ্ট তোমার, প্রিয় তোমার,
প্রেষ্ঠ তোমার যা'কে বল,
তৃপ্ত তুমি তাঁকে না ক'রে
তুমি তৃপ্ত হবে বল?
তোমার চর্য্যার তৃপ্ত করা
তা'তেই থাকে নিয়ন্ত্রণ–

সার্থকতায় সংগ্রথিত
জ্ঞান, বিবেক আর সদ্‌বোধন;
স্থিতি-গতির উর্জ্জনাতে
তৃপ্তি-দীপন চর্য্যাদানে
কৃতি-বিভব উথলে ওঠে
প্রীতিপ্রসূন-ধৃতির টানে;
যা'র ফলেতে সত্তায় তোমার
দীপ্ত দ্যুতি গজিয়ে ওঠে,
যা'র ফলেতে কৃতিচর্য্যায়
তৃপ্তি তোমার ফোটেই ফোটে;
যা'র ফলেতে অটুট নিষ্ঠা
আনুগত্য-কৃতিবেগ
বেড়ে ওঠে, আনে তোমাতে
স্বতঃস্ফূর্ত্ত সুসম্বেগ;
মনুষ্যত্ব ব্যক্তিত্ব তোমার
ওঠেই গজিয়ে ক্রমে-ক্রমে,
সব কাজেতে, সব ব্যাপারে
বল 'নমোহস্তু' স্থিতির দমে। ৯০।

কপট-টান

কাপট্য যে দাপট পায়ে
চ'লছে হৃদয় ছেয়ে,
স্বস্তি ওরে কোথায় পাবি ?
দীর্ণ হৃদয় ভয়ে। ১।

নিষ্ঠা নাইকো যা'র–
বিষ্ঠা-লোলুপ তা'রাই তো হয়
অসতে আব্দার। ২।

নিজের ধান্ধায় তুমি থাক–
লাভ, অলাভ বা অপচয়ে,
তোমার ধান্ধায় যে-জন থাকে
তা'র ধান্ধা এড়িয়ে ভয়ে;
ধান্ধা বহার বান্দা তোমার
যতই দরদ থাক না তা'র,
তোমার ধান্ধা বইবে কি সে
ধান্ধা ব'য়ে চল কি তা'র?

স্বার্থ-খোঁজে বেড়াও ঘুরে
পরের মর্ম্ম বুঝবে কি?
নিজের বেলায় খুব তো হিসাব
পরের বেলায় অবিবেকী। ৩।

প্রাণন-অর্থ ব্যর্থ ক'রে
স্বার্থ খুঁজে চ'ললি ঢের,
ইষ্টার্থকে ক'রলি ব্যর্থ,
ঘুচ্‌লো কি তোর ভাগ্য-ফের? ৪।

আত্মস্বার্থে শকুন-দৃষ্টি
এমনতর লুব্ধ প্রাণ,
যতই ভঙ্গী দেখাক তা'রা
হয় না তা'দের ইষ্টে টান। ৫।

স্বার্থসেবার ইন্ধন ক'রে
প্রণয়-গীতি অনেক গাও,
নেবার বেলায় প্রি'য়র দরদ
দেওয়ায় দেও না একটু ফাও। ৬।

স্বার্থনেশায় ছিন্ন-ভিন্ন
নিয়ে শুধু পাওয়ার আবেগ,
লোক-দেখানো চালে চ'লে
ঠোকায় ফোটে ধাপ্পা-বেগ। ৭।

পেলি এত, দিলি কত?
স্বার্থভরা হৃদয় তোর,
ফাঁকিবাজির দুষ্ট চাওয়া
দেবেও তেমন জনম ভোর। ৮।

স্বার্থপোষা কামের নেশা
নিষ্ঠাহারা চিরদিন,
যখন যেটায় লাগে ভাল–
ভোগনেশারই রয় অধীন। ৯।

অনেকেই পাও, অনেকেই নাও,
দেওয়ায় দিলে একটি ফুল,
পাওয়ার লোভে সদ্‌বৃত্তি সব
খোয়ালি কত, ভাঙ্গলি কুল। ১০।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঈশ্বরভাবনা

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, ঈশ্বর উপরে থাকেন। তিনি উপরওয়ালা। এই জগৎটা তিনিই চালাচ্ছেন। তাঁকে ভক্তি করতে হয়, ভয় করতে হয়। কারণ, তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর ক্ষমতা অসীম।

কিন্তু ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁকে দেখতে কেমন, কী খান, ছবিতে দেখা মুণিঋষিদের মত সব সময় কি ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে আছেন, না কী, কিছুই বুঝতাম না। আবার, শ্রীকৃষ্ণ বা মহাদেব, এঁদেরও সর্বশক্তিমান ব'লে বলা হয়। তাহলে এঁরাই বা কী! ঈশ্বরের সাথে এঁদের সম্বন্ধ কী, না এঁরাই ঈশ্বর! আবার শুনেছি, ঈশ্বর তো এক। তাহলে অনেক দেব-দেবীকেই বা ঈশ্বরের বিশেষণে ভূষিত করা হয় কেন? অন্ততঃ বহু দেবতার ধ্যান, প্রণাম বা অঞ্জলি মন্ত্রে ঐরকমেরই উল্লেখ আছে।

প্রশ্নগুলি খুব সুগঠিত রকমে মনে না এলেও সেই বাল্যকালে যেটুকু জিজ্ঞাসা জাগত, তার পরিষ্কার সদুত্তর কোথাও পাইনি। ফলে, ওসব নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে পড়াশুনা ক'রে তথাকথিত ভাল ছেলে হওয়ার দিকেই ঝোঁক গেল। ঈশ্বর- সম্বন্ধে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই রইল না।

অনেকে আবার ভগবান বা ঈশ্বরকে এক ক'রে বলতেন। বলতেন– যিনিই ভগবান, তিনিই ঈশ্বর। তখন মোটেই জানতাম না যে, ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণের অধিকারী অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যিনি এবং নিত্য ভজমান অর্থাৎ সেবাপরায়ণ যিনি, তাঁকেই ভগবান বলা হয়। তাই, ভগবান বহু হ'তে পারেন; যেমন বলা হয় ভগবান ব্যাস, ভগবান বশিষ্ঠ, ভগবান মনু ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের সব কিছুই আছে, নেই শুধু তাঁর মত আর কিছু। ভগবান সান্ত, কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত। সাধনার ভিতর দিয়ে ভগবান হ'য়ে ওঠা যায়, কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছাময়। ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নরবপু ধারণ ক'রে পৃথিবীতে মাঝে-মাঝে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন। ভগবত্তা ঈশ্বরত্বের অধীন। দুইয়ের মধ্যে এতখানি পার্থক্য বর্ত্তমান।

এ বোধ কোনদিনই গজাত না, যদি না পেতাম পরমপুরুষ পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চরণাশ্রয়। তাঁকে আশ্রয় করেই জানলাম জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, চৈতন্য, বিবর্ত্তন, শিক্ষা, দীক্ষা, জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, মনুষ্যত্ব, প্রেম, নিরাপত্তাবোধ, শিষ্টতা, লোককল্যাণ প্রভৃতির সত্যিকারের অর্থ এবং পরিচয়। প্রতিটি বিষয়ই theoretically (নীতিগতভাবে) এবং practically (বাস্তবে), ছান্দিক বিন্যাস-সহকারে, মঙ্গল-তাৎপর্য্যে, সামগ্রিকতা নিয়ে তাঁর জীবনে ও চরিত্রে মূর্ত্ত ছিল। তাই, সদ্‌গুরু লাভ করা ভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মত সদ্‌গুরু লাভ মহা মহা ভাগ্যের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর শেখালেন, ঈশ্বর আকাশে কোথাও এক নির্দিষ্ট জায়গায় থাকেন না। তিনি সব কিছুরই উৎস, অথচ সর্ব্বব্যাপী। তিনি "বোধস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অথচ বোদ্ধা বা জ্ঞাতা নন"। ঈশ্বর "অনন্ত হয়েও এক," "খণ্ডিত হ'য়েও অখণ্ড," পরিমাপিত হয়েও অপরিমেয়"। তিনি "পরম কারুণিক," "সর্ব্বেশ্বর" অথচ "সমস্ত কারণের কারণ," "জীবন-উৎস"।

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত কথাগুলি আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য মনে হতে পারে। মনে হয় কথাগুলি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে, কথাগুলি বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক তো নয়ই বরং অতি সার্থক এবং ঈশ্বরের যথার্থ ভাবের দ্যোতক।

প্রথমে দেখা যাক, ঈশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী! অর্থের দরকার এইজন্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, শব্দের ধাতুর মধ্যেই থাকে ঐ শব্দটির আসল intent (অভিপ্রায়) এবং purport (ভাবার্থ) যে-কোন শব্দের প্রকৃত মৌলিক অর্থ জানতে ও বুঝতে হ'লে আগে তার ধাতুগত অর্থটিকে জানতে হবে। কারণ, শব্দটির যখন সৃষ্টি হয়, তার পিছনে সক্রিয় ছিল এর স্রষ্টা ভাষা বিদের বিচার ও তত্ত্বানুধাবন-শক্তি। কোন বিষয় বা বস্তুর গুণ ও ক্রিয়া দেখে, সেই ভাবগুলি তা'তে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, এমনতর রকমেই তিনি সেই বিষয় বা বস্তুর নামকরণ করেছেন। তাই, পৃথিবী যা'র থেকে প্রসূত হয়েছে তার নাম সূর্য্য (সৃ-ধাতু), জীবনকে ধরে রাখে যা' তার নাম ধর্ম্ম (ধৃ-ধাতু), ইত্যাদি। এইভাবে প্রতিটি শব্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ধাতুগত অর্থের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শব্দটির আসল তাৎপর্য্য। কোন শব্দই বৃথা ও খেয়ালখুশিমত সৃষ্টি হয়নি। শব্দের এই মৌলিক তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন ক'রে যিনি গূঢ়ার্থটাকে ধরতে পারেন,

ভাষা তাঁর কাছেই জীবন্ত হয়ে ওঠে, সার্থকতা লাভ করে। তাঁর শব্দপ্রয়োগ হয় অমোঘ এবং ব্যঞ্জনাময়। লোকের প্রাণে তা' অনুরূপ সাড়া জাগিয়ে তুলে তাদেরও তদ্রুপভাবে চেতনাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এমনতর সার্থকভাবেই শব্দের প্রযোজনা ঘটিয়েছেন। তিনি দেখালেন, ঈশ্বর শব্দের মূলে আছে ঈশ্-ধাতু, যা'র অর্থ–প্রভুত্ব এবং আধিপত্য। ঈশ্বর সবারই প্রভু এবং অধিপতি। প্রথমে আমরা প্রভু-শব্দের তাৎপর্য্য বোঝার চেষ্টা করব। প্রভুর মধ্যে আছে প্র-ভূ, প্রকৃষ্টরূপে হওয়া। তিনি প্রকৃষ্ট রকমে সব কিছু হ'য়ে উঠেছেন। এ বিশ্বদুনিয়ার অতি বৃহৎ থেকে আরম্ভ ক'রে অতি ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত যা'-কিছু পদার্থ, সবই তাঁর থেকে সৃষ্ট হ'য়ে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এক বিশেষ রূপে উদ্ভূত হ'য়ে উঠেছে। যেমন জল, মাটি, গাছ, মানুষ ইত্যাদি সব-কিছুই ঈশ্বর থেকে জাত। কিন্তু প্রথম সৃষ্টি হ'য়েই তারা আজকের মতন এমন অবস্থায় পৌঁছায়নি। বিবর্ত্তনের বহু ধাপ অতিক্রম ক'রে তারা বর্ত্তমান অবস্থা লাভ করেছে। সেই এক ঐশী শক্তিই নানাভাবে প্রকাশিত হ'য়ে উঠেছে। এই হ'য়ে ওঠার সম্বেগ তাঁর মধ্যে অন্তঃসূত্য ছিল, বিহিত প্রক্রিয়া ও আবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে তা' রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ঐশী-সম্বেগ মাটিতে মাটির মতন ক'রে, জলে জলের মতন, গাছে গাছের মতন এবং মানুষের মাঝে মানুষের মত ক'রে বর্ত্তমান। এক-ঈশ্বর-সম্বেগই সব কিছু হয়ে উঠেছেন; তাই তিনি প্রভু। এখানে আর-একটি ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে। এই হ'য়ে ওঠাটা কিন্তু যেমন-তেমন রকমে হয়নি। বহুর মধ্যে তিনি বিবর্ত্তিত ঠিকই। কিন্তু প্রতিটির মধ্যেই একটি ছান্দিক বিন্যাস আছে। প্রত্যেকটি এককই তার স্বীয় রকমে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুগঠিত এবং সুসঙ্গত। একটা হাতী, একটা খরগোস, একটা লতা, একটা পাহাড়, এমন-কি একটা বালুকণা পর্য্যন্ত যেদিকেই তাকাই, সেই দিকেই আমরা এই ছবি দেখতে পাই। কোন কিছুই অবিন্যস্ত, অগোছালো বা অসুন্দর নয়। ঈশ্বরের অন্যতম বিশেষণ–তিনি চির-সুন্দর। তাই, সৌন্দর্য্য তাঁর সৃষ্টিতেও বর্ত্তমান।

আর, এই হওয়ার বিন্যাসগুলি কোথাও তার নিজস্ব বিশেষত্ব হারায়নি। এই দুনিয়ায় যখনই যেটা সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্ম থেকে চরম পরিণতি পর্য্যন্ত সে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাই-ই থাকে, কেবল নানারকম অবস্থার মধ্যে-দিয়ে চলে মাত্র।

হ'য়ে ওঠার সম্বেগের সঙ্গে-সঙ্গে বজায় থাকার সম্বেগ অর্থাৎ অস্তিত্বের সম্বেগও ঈশ্বরে বর্ত্তমান। তিনি সত্তার উৎস অর্থাৎ জীবনের উৎস। তাই জীবন যাতে বর্ত্তমান থাকে ও উচ্ছল হ'য়ে ওঠে সেই পথের নিশানা পাওয়া যায় ঐশী বিধানের মধ্যে। অস্তিত্বের রক্ষা করার জন্য দুইটি ব্যাপারের আবশ্যক,–এক, জীবন যাতে রক্ষিত, পালিত ও পোষিত হয় তাই করা, দুই, জীবনবিরোধী যা', যা' অস্তিত্বকে বিনষ্ট বা ধ্বংস করতে চায় তাকে প্রতিরোধ করা। ঐশী বিধানের মধ্যে এই দুটি শক্তিই ক্রিয়াশীল। সেইজন্য ঈশ্বর যেমন সচ্চিদানন্দময়, তেমনি অসৎ-নিরোধী। অসৎ অর্থাৎ সত্তাবিরোধী যা', মৃত্যুপন্থী যা', যা' জীবনকে ক্ষীন্ন, ক্ষুণ্ন, জীর্ণ ও অবসন্ন ক'রে তোলে, ঈশ্বরের বিধান তা'কে চূর্ণ করে, ক্ষয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "ঈশ্বর জীবনের ধর্ম্ম, মরণের নয়।" আরও বলেছেন, "ঈশ্বরই সাত্ত্বিক সম্বেগ," "ঈশ্বরই জীবন-উৎস," "অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের পূত-দীপনা"।

জীবনপিয়াসী যা'রা, কল্যাণের পথে যা'রা চলে এবং অপরকেও চলবার প্রেরণা যোগায়, তারাই ঈশ্বরের আশিস্‌ধন্য। যা' জীবের শাশ্বত ও সাত্বত কল্যাণকে রুদ্ধ করে, তার সাথে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নেই। ও-পথ ঈশ্বরের বিপরীতে–শয়তানের পথ।

সেইজন্য যদি কেউ ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে সত্তাবিরোধী বা অকল্যাণের পথে চলে ও নানা যুক্তিজাল বিছিয়ে সেই চলাকে সমর্থন করে, সে নিশ্চিতই ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত হয়, অথাৎ ভালো-থাকা থেকে বঞ্চিত হয়। ঈশ্বর হলেন স্বস্তিনিদান। মানুষ তথা জীবকুল যাতে স্বস্তিতে অর্থাৎ সু-অস্তিতে থাকে, তারই বিধাতা তিনি। তাঁর পথে যে চলে, সে অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পায়। অনেক সময় দেখা যায়, রাম হয়তো ক্রোধবশতঃ কটু কথা ব'লে শ্যামের মনে ব্যথা দিল। এতে শ্যামের মন খারাপ হ'ল, অশান্ত হ'ল, তার অস্বস্তির কারণ সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু এই অস্বস্তি ঘটিয়েও রাম ভালো থাকলো, তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগল। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে– তাহ'লে অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েও ঈশ্বর-করুণা লাভ করা সম্ভব? উত্তর হ'ল, সবটুকু না দেখে কোন কিছুর বিচার করা যায় না। শ্যামের মনে অস্বস্তি ঘটিয়ে আজ হয়তো রাম ভালো আছে, কিন্তু মানুষের মনে ব্যথা দেওয়ার প্রবৃত্তিটা রামের ভিতরে রয়েই গেল। অপরের মনে ব্যথা দিলে সে যে দুঃখ পেতে পারে এবং তার সেই ক্ষোভ তার আপনজনের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে রামের প্রতি তাদের মন বিষাক্ত ক'রে তুলতে পারে, এ-সম্বন্ধে রাম সচেতন হ'ল না। নিজের ভিতরের ঐ ত্রুটি অপসারণের জন্য সে কোন চেষ্টা করল না। ফলে, সে শ্যামের মত আরো অনেকের প্রাণে ব্যথা দিয়ে চলতে থাকবে। তার এই চলনে ধীরে-

ধীরে লোকে তার উপর ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হতে থাকবে। মানুষকে সে হারাবে। আর, একটা মানুষ হারানো মানে তার ও তার আপনজনের ভালবাসা, সাহায্য, সহানুভূতি, সব হারানো। এইভাবে সে অস্বস্তির গর্ত্তে পড়ে। মানুষ যদি মানুষের পাশে না থাকে, তবে অন্য কোন সম্পদ মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। কারণ, সম্পদ মানুষ সৃষ্টি ক'রে না, মানুষই সম্পদ সৃষ্টি ক'রে থাকে। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র একটা মানুষের তুলনায় একটা সাম্রাজ্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে থাকেন। মানুষকে হারাবার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না।

ঈশ্বর মঙ্গলময়। জীবনের মাঙ্গলিক অভিধান যা'-কিছু তা' তিনিই। তিনি তাঁরই প্রতিরূপ ক'রে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন– বাইবেলের উক্তি এমনতরই। এই মানুষ সৃষ্টির সময় ঈশ্বর তাঁর নিজের শক্তিও দান করেছেন মানুষকে। তাঁর গুণাবলী স্ফুলিঙ্গ-আকারে সবই মানুষের মধ্যে আছে। তিনি পূর্ণ, তাই, তাঁর সৃষ্টির যে-কোন পদার্থই পূর্ণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, প্রতিটি মানুষই এক-একটি "ক্ষুদে ঈশ্বর"। ঈশ্বরের চাহিদা–মানুষ ঐ শক্তিগুলির সদ্ব্যবহার ক'রে তাঁর দিকে ফিরে আসুক, বোধ করুক তাঁকে। তিনি আমাদের অনন্ত সম্পদ দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, কর্ম্মক্ষমতা দিয়েছেন। এগুলি নিয়ে আমরা যদি সর্ব্বতোভাবে তাঁর হ'য়ে না উঠি তাহ'লে তাঁর দয়া উপলব্ধি করতে পারি না। যেমন, বাবা ছেলের জন্য হাজার দরদ, সহানুভূতি নিয়ে করলেও ছেলে তা' কিছুই বুঝতে পারে না– যতক্ষণ না ঐ ছেলে বাবার প্রতি আগ্রহ নিয়ে তাঁর জন্য কিছু ক'রে। ছেলেও যদি বাবার প্রতি অন্তরাসী হ'য়ে তাঁর সেবা ক'রে চলে, তখনই সে বাবার ঐ করা বোধ করতে পারে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই নিয়ম। ঈশ্বরের অভিপ্রেত পথে চললেই তিনি হ'য়ে ওঠেন আপ্ত অর্থাৎ আপন এবং প্রাপ্ত (প্র-আপ্ত)। তখনই মানুষ বোধ করতে পারে তাঁকে, তাঁর করুণাকে। আর, এই পথ প্রতিটি মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। প্রত্যেকেই সম্যক ইচ্ছা ও বিহিতপথে চেষ্টা করলে এ বোধের অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "ঈশ্বর সবারই আপ্ত", "ঈশ্বর সবারই স্বীকার্য্য"।

ঈশ্বরকে এমনভাবে উপলব্ধির ভিতর-দিয়ে জীবনে আপন ক'রে তোলাই ঈশ্বরদর্শন। দর্শন মানে যেমন দেখা ও হয়। তেমনি জ্ঞানলাভও হয়। এছাড়া, চার হাতওয়ালা, তিন মুখওয়ালা কিম্ভুতকিমাকার কিছু অথবা বিরাট কোন আলোর ঝলকানি দেখাকে ঈশ্বরদর্শন বলে না। সাধনার পথে ওসব অনেকে দেখতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর যদি প্রকৃতপক্ষে জীবনে আপন না হ'য়ে ওঠেন, তাঁর অভিপ্রেত সৎ, সুন্দর ও শিষ্টপথে চলা না হয়, তাহলে ঐ-সব আজগবী ব্যাপার হাজার দেখার পরে ও মানুষ আবার শয়তানী করতে পারে, অসৎপথে চলতে পারে।

এই প্রসঙ্গে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছেন–"যে ঈশ্বরদর্শন করেছে সে কিন্তু পাপ করতে পারে না।"

এ জগতে পথ দুটি– সত্তাপথ ও বৃত্তিপথ। সত্তাপথ ঈশ্বরের, প্রবৃত্তিপথ শয়তানের। শয়তান হ'ল ঈশ্বরের বিরুদ্ধশক্তি। ঈশ্বর ও শয়তানের সংগ্রাম পৃথিবীতে নিরন্তর চলেছে। এ সংগ্রাম দেবাসুরের সংগ্রাম, সৎ-অসৎ এর দ্বন্দ্ব, শুভাশুভের বিবাদ। মানুষ যখন ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিগুলি তাঁর ঈপ্সিত পথে ব্যবহার না ক'রে খেয়ালখুশি মত অকল্যাণের পথে ব্যবহার ক'রে চলতে থাকে, তখন সে ঐ ভাবে আবদ্ধ ও অভিভূত হ'য়ে ঐ বৃত্তের মধ্যে প'ড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই,

দৃষ্টি আকর্ষণ

সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার জন্য আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন। সেই সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

সৎসঙ্গ সংবাদ প্রেরণকারী/ লেখকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ-পরিচ্ছন্ন কাগজের একপাশে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

-সম্পাদক

ঐ ভাবের নাম দেওয়া হয়েছে বৃত্তি। মানুষ যখন ঈশ্বরের আহ্বানের দিকে পিছন ফিরে বৃত্তিপথে চলতে থাকে, তখন তিনি ব্যথা পান। মানুষের অন্তরস্থ ঈশীসম্বেগ সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। আর তখনই মানুষের জীবনে দুঃখকষ্টের সৃষ্টি হয়।

এখানে প্রশ্ন আনা যেতে পারে– ঈশ্বর যদি সৎস্বরূপ, কল্যাণময়, তাহলে মানুষ যাতে কল্যাণের পথেই চলে– এই প্ররোচনা দিয়েই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতে পারতেন! তিনি তো মানুষের ভিতর থেকে অসৎপথে চলার মনোবৃত্তি একদম অপসারণ ক'রে দিতে পারতেন। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বড় সরল ভাষায় বলেছেন, "জবরদস্তির ভিতর দিয়ে পীড়িত হয় না।" ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনভাবে চলার শক্তি ও বুদ্ধি দিয়েছেন। সে ইচ্ছা করলে সৎপথেও চলতে পারে। ইচ্ছামত চলার শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে যদি অসৎপথে না যায়, বৃত্তিপথে না চ'লে ঈশ্বর অনুগামী হয়, তাহ'লে ঈশ্বর সুখী হন। ঈশ্বর আমাদের আলিঙ্গন ক'রেই আছেন। তাঁর দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি। আমরা যদি তাঁকে গ্রহণ করি অর্থাৎ তাঁর পথে চলি তখনই লীলা সার্থক হ'য়ে ওঠে। লী-ধাতু আলিঙ্গনে, লা-ধাতুর অর্থ গ্রহণ। শুধু আলিঙ্গন বা শুধু একতরফা গ্রহণে লীলা সার্থক হ'য়ে ওঠে না। লীলা সার্থক হওয়ার জন্য 'আলিঙ্গন-গ্রহণ' উভয়েরই প্রয়োজন। ঈশ্বর লীলাময়। তিনি মানুয়ের সাথে লীলা করতে চান, মানে মানুষ অকল্যাণের পথ ত্যাগ ক'রে তাঁর অভিমুখী হ'য়ে উঠুক, এই চান। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সাথে গোপ-গোপীগণের ব্রজলীলা এই-ই। আর কিছু নয়। তাইতো, গোপীবৃন্দের পদরজঃ ভক্তগণের নিত্যকালের কাম্য। এ-ছাড়া, লীলা বলতে যদি কেউ তথাকথিত play (আমোদ-প্রমোদ) বা sportiveness (কৌতুকাসক্তি) মনে করেন, তা'হলে ভুল বোঝা হ'য়ে যাবে।

ঈশ্বর বিরোধী চলন যে প্রবৃত্তিপথ, তা' দুঃখকষ্টেরই স্রষ্টা। কিন্তু কোন মানুষই ইচ্ছা ক'রে দুঃখকষ্টের আবর্ত্তে পড়তে চায় না। অথচ সত্তাপ্রীতির চাইতে প্রবৃত্তিপ্রীতি কোন-কোন সময় বড় হ'য়ে যায় এবং মানুষ প্রবৃত্তিমার্গে চ'লে দুঃখকষ্ট ডেকে আনে। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বলে ঐ পথে চলতে পারে, আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু ঐ পথে চলার ইচ্ছাটা প্রেরণা পায় কোথা থেকে? সেই প্রেরণার উৎস হ'ল অজ্ঞানতা। শাস্ত্রে, সাহিত্যে, মনীষী-বচনে অজ্ঞানতাকে পাপ বা অন্ধকার ব'লে বর্ণনা করা আছে। নীচের দিকে চলায় কষ্ট কম হয়, কিন্তু উপরের দিকে ওঠা কষ্টসাধ্য। প্রবৃত্তিপথ নীচের দিকেই টানে ; তাই সে-পথে চলা সহজই হ'য়ে থাকে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা! ঈশ্বরের পানে যেতে হ'লে কষ্ট ক'রেই উঠতে হয়। ঈশ্বরের অভিপ্রেত যা' নয় এমনতর লোভ-লালসা, ভোগবাসনার প্রতি সামান্যতম প্রীতি থাকলেও মানুষ অজ্ঞান-অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং দ্রুত নীচের দিকে নামতে থাকে। অজ্ঞানতা থাকলেই মানুষ উৎস যিনি, সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তাঁর প্রতি বিমুখ হয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রতি বিমুখতা ডেকে আনে ভ্রান্তি এ অবস্থায় মানুষ পদে-পদে ভুল করতে থাকে। একটা ভুলের উপর প্রীতি অনেক ভুলকে আমন্ত্রণ করে। ঠিক এই ক'রেই আদম এবং ইভ ঈশ্বর-কর্তৃক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হলেন। শয়তান-কতৃক তাঁরা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, তার মানে, তাঁরা ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ ঈশ্বরের রাজত্ব থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। প্রথম পিতামাতার সেই ভুল আজও মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করে চলেছে। আজও মানুষ প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ হয়ে দুঃখ-কষ্টের আবর্ত্তে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ সত্য চিরন্তন। বংশানুক্রমিকতা (Heredity) একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। পিতার গুণ বা অবগুণ কমবেশী রকমে সন্তানে বর্ত্তায়। এই কম বা বেশী হওয়ার মাপকাঠিটা নির্ভর করে মায়ের উপরে। মা সন্তানের জীবনকে মেপে দেন। মাতা শব্দের মা-ধাতুর অর্থও পরিমাপ করা। তাই তাঁর নাম মা। কোন লোক যদি একবার অজ্ঞানতাকে আশ্রয় ক'রে, তার ফল তার জীবনে ক্রিয়াশীল না হ'লেও তার সন্তান-সন্ততির উপর যেয়ে বর্ত্তাবেই। এক পুরুষে না হ'লে দুই বা তিন পুরুষে এটা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বহু স্বেচ্ছাচারী, ভোগোন্মত্ত, অসংযত-জীবনযাপনকারী ধনী বা জমিদারের নাম করা যেতে পারে, যাদের দুই বা তিন পুরুষের মধ্যেই টাকাপয়সা, লোকলস্কর সব ভোজবাজীর মত উবে গেছে, নেমে এসেছে দুঃসহ দারিদ্র্য, রোগব্যাধি, বুদ্ধিভ্রষ্টতা এবং আরো অনেক কিছু। এ সবই কিন্তু ঈশ্বরবিমুখতা তথা প্রবৃত্তিমার্গগামি– তারই অবদান। ঈশ্বরের এই অমোঘ বিধান থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কারো নেই।

কিন্তু প্রবৃত্তি তার কাজ করবেই অর্থাৎ আমাদের টেনে নামাতে চাইবেই, শয়তান প্রলোভন দেখাবেই। প্রবৃত্তিকে একদম অগ্রাহ্য ক'রে প্রচণ্ড সম্বেগে ঈশ্বরের পথে গতিশীল না হ'লে কিছুতেই ঐ অভিভূতি মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে না। ভূতে পাওয়া রোগীর মত ঐ প্রবৃত্তি তাকে যখন যেভাবে চালায়, সেই ভাবেই চলতে হয়। তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রয়োগের শক্তিও

তিরোহিত হ'য়ে যায় । এইভাবে ঈশ্বরের সন্তান হয়েও মানুষ আর তাঁর থাকে না । কেউ হয় কামের মানুষ, কেউ ক্রোধের মানুষ, কেউ লালসার মানুষ, কেউ হিংসার মানুষ, ইত্যাদি; অর্থাৎ আমাদের যে সর্ব্বশক্তিমানের দাসত্ব করা উচিৎ, তা' না ক'রে আমরা করতে থাকি কামের দাসত্ব, ক্রোধের দাসত্ব ইত্যাদি । কে আমার প্রভু তা' ভুলে যাই । আমরা যাকে প্রভু ক'রে, যার মনোমতন চলি, তেমনতর হ'য়ে উঠি ও সে যেমন ফল দিতে পারে সেই ফলই পাই ।

আমরা আগেই দেখেছি, ঈশ্বর সব-কিছুর মধ্যেই অবস্থিত । সর্ব্বব্যাপী ব'লেই সর্ব্বত্র তাঁর স্থিতি । সেই অর্থে তিনি স্থাণু, অচল, সনাতন । কিন্তু দ্রষ্টা ঋষি শুধু ঈশ্বরের এই একটি রূপই দেখেননি! তাঁরা দেখেছেন, ঈশ্বর যেমন অচল, তেমনি নিরন্তর চলমান । (দ্রষ্টব্য–"তদেজতি তন্নৈজতি....," ঈশোপনিষদ্) । তিনি কোথাও নড়াচড়া বন্ধ হ'য়ে একেবারে থেমে নেই । সতত চলমানতা তাঁর অন্যতম গুণ । জগতে কোন-কিছুই গতিহীন হ'য়ে থেমে নেই । সর্ব্বদা গতিশীল ব'লেই এর নাম হয়েছে জগৎ (গম্-ধাতু) । জগৎ চলেছে বিবর্ত্তনের (evolution) পথে । বিভিন্ন রকম অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য-দিয়ে আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে প্রতিটি পদার্থই এগিয়ে চলেছে পরিণতির পথে, বিবর্দ্ধনের পথে । আবার প্রতিটি সত্তার ভিতরেই অস্তিত্বের আবেগ বা থাকার আবেগ সংহত আকূতি নিয়ে বিদ্যমান । এই আবেগ কিন্তু সতত সক্রিয় । আত্মা-শব্দস্থিত অত্-ধাতুর মানেও সততগতি । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ঈশ্বরই সত্তার আত্মিক সম্বেগ," "ঈশ্বরই বর্দ্ধন-সম্বেগ," "ঈশ্বরই বিবর্দ্ধনার আধার," "ঈশ্বর অহং-এর আত্মিক ভূমি" ।

এক অনন্ত অখণ্ড অপরিমেয় ঈশী-সত্তাই বহুরূপে রূপায়িত । তিনি এক ছিলেন, বহু হয়েছেন । ঐ এক-জীবনবর্দ্ধনী সম্বেগের আকূতির ঐক্য, ঋত (গতি) ও সত্যের (অস্তি) ঐক্য । আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রতিটি পদার্থই টিকে থাকতে চায় ও বেড়ে চলতে চায় । এই চাহিদা সবার ক্ষেত্রেই একই রকম । পাত্রানুপাতিক তা' অবশ্য কম বা বেশী হ'তে পারে । এই অর্থে ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ । কিন্তু ঐশীজ্যোতিঃ যখন মাটি, মানুষ, পাখী, পতঙ্গ ইত্যাদিতে পরিণত হ'চ্ছেন, সেখানে তিনি অনু ও জীবকোষগুলির বিশেষ বিন্যাসে, শক্তির এক বিশেষ সক্রিয়তায়, বিবর্ত্তনের এক বিশেষ অধ্যায়ে এক বিশেষ রূপ নিয়ে আবির্ভূত । বিশ্বসংসারের প্রতিটি পদার্থে এই বিশেষত্ব পরিস্ফুট তার নিজস্ব রকমে । এইখানে ঈশ্বরসত্তা সবিশেষ; তাঁর অখণ্ড সত্তা ব্যষ্টিগতভাবে খণ্ডিত, অনন্ত অপরিমেয় সত্তা প্রতি বস্তুতে সীমিত এবং পরিমাপিত । শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ঈশ্বর প্রতিটি বিশেষে বিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষ ।" যখন তিনি সর্ব্বব্যাপী তখন বিশেষ কোন গুণের দ্বারা অভিভূত নন; তাই, তখন তিনি গুণাতীত বা নির্গুণ । কিন্তু সেই বস্তুসত্তার দিক দিয়ে বিচার করা হবে, তখন দেখা যাবে, তিনি সগুণ বা গুণঘন অর্থাৎ গুণ সেখানে ঘনীভূত । ঈশ্বরের কোন বিশেষ গুণ সেখানে একটি বিশেষ অবস্থার মধ্য-দিয়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে । এইভাবেই কেউ হ'য়ে উঠেছে কঠিন, কেউ তরল, কেউ বিরাট, কেউ ক্ষুদ্র, আবার কেউ দয়ালু, কেউ বা হিংস্র ইত্যাদি । এই অর্থে ঈশ্বর কেবলমাত্র প্রভু নন, তিনি বিভুও বটেন । বিভু অর্থাৎ বি-ভূ–বিশেষ প্রকারে, বিশেষত্ব নিয়ে হ'য়ে উঠেছেন যিনি । এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, "ঈশ্বরই পরম বিভু, ঈশ্বরই জীবনের জীবন-বিভব ।"

ঈশ্বরই যখন কোন গুণের দ্বারা অভিভূত নন, তখন তিনি গুণাতীত বা নির্গুণ,–সত্ত্ব, রজঃ, বা তমঃ কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না । কিন্তু জগতের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ ঐ তিন গুণের কোন-না-কোন গুণের দ্বারা যুক্ত । আহার্য্য, দান, লোক-ব্যবহার প্রভৃতি যে-কোন বিষয় বা বস্তু কোনটা সাত্ত্বিক-গুণযুক্ত, কোনটা রাজসিক, আবার কোনটা বা তামসিক । নির্গুণ ঈশ্বর থেকে জাত পদার্থরাজি গুণযুক্ত হয় কিভাবে? –গুণ ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন । যখন তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, পরম দাতা, অস্তিত্বের ধারণপালনী সম্বেগ, তখন সৃষ্টির ইচ্ছা তাঁর মধ্যে নেই । সগুণ অর্থাৎ গুণযুক্ত হ'লেই সেই পরাৎপরের মধ্যে জেগে ওঠে সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির ইচ্ছা । যখন যেমনতর গুণসংযোগ হয়েছে, তখন সেই সেই গুণবাহী বস্তু বা বিষয় সৃষ্টি হয়েছে । সেইজন্য ঈশ্বর সগুণও বটেন, আবার নির্গুণও বটেন ।

ঈশ্বর নিরাকার, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর । কান তাঁকে শুনতে পায় না, চোখ তাঁকে দেখতে পায় না । কিন্তু তিনি সব শোনেন, সব দেখেন । তিনি কর্ণের কর্ণ, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি । শাস্ত্রে এইভাবে ঈশ্বরের পরিচয় আছে । তিনি সম্বেগ-স্বরূপ । নির্দ্দিষ্ট কোন আকার তার নেই । শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন "ঈশ্বরই অমর সম্বেগ", "পরমধৃতি-সম্বেগ", "বিবর্ত্তনী সম্বেগ", "যোগ্যতার যুত-সম্বেগ", ইত্যাদি । এই সম্বেগের বাস্তব (concrete) কোন আকার (form) নেই । কিন্তু এই নিরাকার পূর্ণ সত্তা যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মধ্য-দিয়ে নীহারিকা, গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিদ, জল ইত্যাদি আকারে আকারিত হচ্ছেন তখন তিনি সাকার । তাই, ঈশ্বরকে শুধু নিরাকার বা শুধু সাকার বললে ভুল হবে । তিনি সাকার-নিরাকার দুই-ই । আবার,

সাকার-নিরাকারের পারেও তাঁর আসন বর্ত্তমান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তাঁর একটি মাত্র অংশে এই জগতের অবস্থিতি। এর পারেও তিনি বর্ত্তমান।

উপরের কথাগুলি সব পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, কিভাবে পরস্পরবিরোধী ভাবগুলি ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। তাহলে প্রথমের দিকে এই বিষয়ে যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করা হয়েছিল, এখন তার নিরসনের সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ ক'রে তার মর্ম্মসত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেছেন। অচ্যুত ইষ্টকেন্দ্রিক তীব্র তপস্যার ভিতর-দিয়ে ঐ সূত্ররাজীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া সম্ভব। আর, এ তপস্যা শুধু কর্ম্মহীন তপস্যা নয়। তপস্যার মধ্যে আছে ইষ্টানুকূল চলন এবং তদ্‌ব্যতিরিক্ত যা'-কিছু তার বর্জ্জন।

ঈশ্বরে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণাবলীর সমাবেশের কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে অতি সংক্ষেপে অথচ সুন্দর ক'রে বললেন– "Where every oppsite meets with a meaningful go, Godhood peeps there", (সার্থক সঙ্গতি-সহ পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মের আবাস যেখানে, সেখানেই ঈশ্বরত্বের অবস্থিতি)। শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরই নন, আবহমানকাল থেকে উপলব্ধসত্য দ্রষ্টাপুরুষগণ এই সত্য ঘোষণা ক'রে আসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আরো পরিষ্কার ক'রে এক জায়গায় বলেছেন, "ঈশ্বরে সমান্তরাল ও বিপরীতের মিলন",।

ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগৎ-সৃষ্টি। তিনি ইচ্ছাময়। বাইবেলে আছে তিনি চাইলেন অন্ধকার দূরীভূত হোক, অন্ধকার দূর হ'ল; তিনি চাইলেন এবার আলো হোক, আলো হ'ল। তাঁর ইচ্ছামাত্রেই সব-কিছু ঘটছে এবং ঘ'টে থাকে। ব্যাপারটা শুনতে যেন খানেকটা ভোজবাজী খেলার মত। যাদুকর যখন যা' ইচ্ছা করছে তাই হচ্ছে। এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিশেষভাবে বলেছেন–স্রষ্টা কখনও যাদুকর নন। যাদুর ধারও তিনি ধারেন না। যে সব বিষয় বা ব্যাপারের কারণ আমরা ঠিক মত জানি না, তাই-ই আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য, তাই-ই আমাদের বিষয়ের উদ্রেক করে। আবার, কেবল কারণ জানলেই হয় না ; কারণটা যে-যে বিশেষ ধাপ অতিক্রম ক'রে কার্য্যে ফুটন্ত হয়ে উঠেছে, সেই ধাপগুলিও যদি ক্রমপর্য্যায়ে ঠিকমত বোঝা না থাকে, তাহ'লেও কোন ব্যাপার ভোজবাজীর মত লাগতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন বাস্তবে মূর্ত্ত (materialised) হয়, তখন তা' হওয়ার জন্য উপাদান ও উপকরণের যে-যে বিশেষ ধরণের বিন্যাস ও সঙ্গতিসাধনের প্রয়োজন তা' যথাযথভাবে সেখানে হয়েছিল। হয়েছিল ব'লেই সেই বিশেষ পদার্থের আবির্ভাব সম্ভব হ'য়ে উঠেছে। ইচ্ছা মানেও কেবলমাত্র একটা কর্ম্মহীন মনস্কামনা নয়। ইচ্ছা-শব্দের ধাতু ইষ্, অর্থ–পুনঃপুনঃ করা। কোন একটা কাজে চরম সার্থকতা লাভের জন্য সেটাকে পুনঃপুনঃ করার দরকার হয়, সেটাই ইচ্ছা। ঐশী বিধানের মধ্যে এই এষণা বা ইচ্ছা সম্বেগ অভিনিবিষ্ট। এই সম্বেগই বিহিত প্রকরণের মধ্য-দিয়ে এক এক জায়গায় এক এক রূপ নিয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

যে বিশেষ প্রকরণকে আশ্রয় ক'রে ঈশ্বরের ইচ্ছাসম্বেগ সৃষ্টিতে মুর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, সেই প্র-করণই হ'ল প্র-কৃ-তি। প্রকৃতি আর বিশেষ কিছু নয়। প্রকৃতি হ'ল প্রকৃষ্টভাবে করা। কিন্তু প্রকৃতি ও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে যে, তিনি তাঁর প্রকৃতিতে আশ্রয় ক'রে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ক'রে থাকেন।

সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির বুকে এলোমেলো (haphazard) বিন্যাস হ'লে হবে না, চাই একটা বিধায়িত বিন্যাস। বি-ধা অর্থাৎ বিশেষ ধারণশক্তি ঈশ্বরের মধ্যে আছে ব'লেই তিনি বিধি বা বিধাতা। ধারণের বিপরীত শক্তি ভাঙ্গন, বিচ্ছিন্নতা, ছেদন, –এ শক্তি ঈশ্বরের নয় শয়তানের। যা' পারস্পরিক মিলন ও সংহতি নিয়ে আসে, পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে, বিচ্ছিন্নকে সংগ্রথিত করে, মুমূর্ষুকে সজীব ক'রে তোলে, ঊষরকে শস্যশ্যামল ক'রে তোলে, সঙ্কীর্ণকে প্রসারিত ক'রে দেয়, অল্পকে ভূমায়িত ক'রে তোলে, মরণকে স্তব্ধ করে, ঈশ্বরের বিধান সেখানেই ক্রিয়াশীল। ঈশ্বর যেমন বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তেমনি বি-ধা-তা, অর্থাৎ বিশেষ ধারণপোষণকর্ত্তা। ঈশ্বরের বিধান যে রক্ষা ক'রে চলে, সে পালিত ও পোষিত হয়। কিন্তু যে ঐ বিধি মানে না, অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে, সে ঐ ক্ষয়, বিন্যাস ও মৃত্যুর কবলে যেয়েই পড়ে। তিনি বিধি; তাই তাঁর বিধানে ফাঁকিবাজীর কোন ব্যাপার নেই। যেমন করা যাবে তাই হবে। আবার, যা' করলে যা' হয় তা' করলে তাই-ই হ'য়ে থাকে। এ বিধি অমোঘ এবং শাশ্বত। বিধিকে যতটুকু ফাঁকি দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করতে চাইব, আমিও ততটুকু ফাঁকিতেই প'ড়ে যাব। শ্রীশ্রীঠাকুর বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছেন, "ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা'।"

এইবিধিরূপী ঈশ্বর সর্ব্বক্ষেত্রেই সমান। তাঁর বিকাশ সর্ব্বক্ষেত্রেই সমান। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, –তাই যদি হবে তাহ'লে সব-কিছু সমানচৈতন্যসম্পন্ন নয় কেন? এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, সমান মানে স-মান; আর মান মানে পরিমাপ, ওজন। যার ওজন বা মান যেমন, ঈশ্বর সেখানে

সেই বিভূতি নিয়ে বিকশিত । এই মান হ'ল বৈশিষ্ট্য, যা' একটি পদার্থকে অন্য একটি পদার্থ থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে । এই স্বতন্ত্রত্ব বা বৈশিষ্ট্য সবারই আছে । সৃষ্টি ধারার বিভিন্ন স্তরে এক-একটি পদার্থ এক-এক বিশেষ ধরণের গুণ (attribute), ধর্ম্ম (property) ও সক্রিয়তা (activeness) নিয়ে বিকাশ লাভ করেছে । ঈশ্বরত্বও সেখানে সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা মান-সহ সীমিত ও পরিমাপিত (Limited and measured) । এই অর্থে ঈশ্বর সবার কাছেই সমান । "ঈশ্বরই বস্তু ও ধর্ম্মের পরম ধাতা" –শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ।

ঈশ্বর শুধু প্রভু বা বিভু নন; তিনি অধিপতিও বটেন । অধি-শব্দের মধ্যে আছে ধা-ধাতু (ধারণ) এবং পতি-শব্দের মধ্যে আছে পা-ধাতু (পালন) । তাই, অধিপতি শব্দের অর্থ শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন– ধারণপালনী সম্বেগ, অর্থাৎ ধ'রে রাখা ও পালন করার আকূতি । ধ'রে রাখার আকূতি মানে ভেঙ্গে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া, নিভে যাওয়া, জীর্ণ হওয়া, নিঃশেষ হওয়ার বিপরীত শক্তি । আর, পালন করার আকূতি মানে রক্ষা করা, বাঁচানো, বেড়ে উঠতে সাহায্য করা । এই দুটি সম্বেগ যেখানে যত ক্রিয়াশীল ও তীক্ষ্ণ, সে তত বড় অধিপতি, তত বড় ঈশ্বর । ঈশ্বরে এই গুণ পূর্ণ মাত্রায় ও চরমশক্তিতে বিরাজমান, তাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিপতি ।

জ্ঞানস্বরূপতা ঈশ্বরের অন্যতম পরিচয় । শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন,"ঈশ্বরই পরম বেদ", "ঈশ্বরই পরম বিজ্ঞান", "ঈশ্বরই বোধদীপনা" । তাঁতে যে যুক্ত থাকে নিরন্তরতা নিয়ে, সে হয়ে ওঠে বোধমান, জ্ঞানী । জগতের কোন কিছুর রহস্য তার কাছে অজ্ঞাত বা দুর্ব্বোধ্য বা দুর্জ্ঞেয় থাকে না । ঈশ্বরের এই জ্ঞানময় সত্তা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলেছেন, "ঈশ্বর চিরচেতন, তিনি চিরজাগ্রত, অবধান-তৎপর", "ঈশ্বর সবাতে চেতনসম্বেগ নিয়ে বিরাজমান", "তিনি চিৎ-ধা" । চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যকে ধারণ করেন বলে তিনি চিৎধা । পরমচৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বকে যিনি যতখানি অধিগত করতে পেরেছেন, জগতে তিনি ততখানি চৈতন্য লাভ করেছেন, তাঁর বোধ ও দর্শন ততখানি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত । "ঈশ্বরই সব যা কিছুর অর্থ ।" তাই, তাকে উপলব্ধি করতে পারলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার ও বিষয়ের অর্থই পরিস্ফুট হ'য়ে থাকে । ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কিছুতে যুক্ত বা আসক্ত হ'লে এ জ্ঞানের উদয় হয় না । কারণ, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্তাতেই সর্ব্বতোমুখী পূর্ণতা নেই । তাই, ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য ।

ঈশ্বর করুণাময় । তাঁর করুণার ধারা উৎস হ'তে অবিরল ধারায় ক্ষরিত হ'য়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে, অবিরামভাবে বইছে তাঁর দয়ার বাতাস । তাঁর ধারণ ও পালন-সম্বেগ সমগ্র বিশ্বকে তৎস্বরূপে রেখে বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে । এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । তবু ও মানুষ তার প্রবৃত্তিসমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাঁর করুণার প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারে না ব'লে অনেক সময় ঈশ্বরকে ভুল বোঝে, পরীক্ষা করতে যায় । পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অবতার-মহাপুরুষের মত শ্রীশ্রীঠাকুরেরও উক্তি–"ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যেও না ।" কারণ, ভয়েই হোক, দুর্ব্বলতাতেই হোক, অজ্ঞতাবশতঃই হোক আর আক্রোশের জন্যই হোক, মানুষ যদি তার সীমিত বোধ নিয়ে অসীমকে পরীক্ষা বা বিচার করতে যায় তাহলে বিভ্রান্ত হওয়ারই সমধিক সম্ভাবনা । তা'তে ঈশ্বর-সম্বন্ধে ভুল ধারণা বা অবিশ্বাস সৃষ্টি হ'য়ে যেতে পারে । একটি উদাহরণ নেওয়া যাক । একজন লোক খুব গরীব, সম্প্রতি সে বিপাদাপন্ন হ'য়ে পড়েছে । তার কষ্টমোচনের জন্য জাগতিক প্রচেষ্টা অনেক করা সত্ত্বেও কোন ফল হচ্ছে না । গরীব লোকটির উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে কেউ হয়তো ব'লে ব'সলেন–ঈশ্বর যদি সত্য হন তাহলে আর একদিনের মধ্যেই লোকটির সঙ্কট মোচন হোক । বাস্তবে হয়তো দেখা গেল, দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হ'য়ে গেলেও লোকটির সঙ্কট মোচন হ'ল না । তখন ঐ বক্তার ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল ধারণা বা অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয় । আসলে ঐ গরীব লোকটি যে গরীব বা আপদগ্রস্থ হ'য়েছে, তার পিছনে আছে তার সত্তাবিরোধী অমঙ্গলকর প্রবৃত্তিমুখী চলন । সুদীর্ঘকাল তেমন চলনের ফলে সে নিজেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের পথ থেকে সরিয়ে নিয়েছে । প্রসারণেই সুখ, সঙ্কোচই দুঃখ । কিন্তু সে প্রবৃত্তির জালে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ার দরুন সঙ্কুচিতই হ'য়ে পড়েছে । ফলস্বরূপ, দুঃখকষ্ট তার জীবনে অনিবার্য্য হ'য়ে উঠেছে । শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "কৃপা মানে ক'রে পাওয়া" । ঈশ্বরের ঈপ্সিত পথে কর্ম্ম ক'রে ও চ'লে মানুষ যতখানি কল্যাণ লাভ ক'রে তাই তার কৃপালাভ । গরীব লোকটি ঐ পথে চলে নি । তাই, পাওয়ার পথ অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা আসার পথ সে নিজ হাতেই রুদ্ধ করেছে । এখন, 'ঈশ্বর কৃপা করুণ' বলে চীৎকার সে করতে পারে । অবিশ্রান্ত স্রোতধারার মত ঈশ্বর কৃপাও বর্ষিত হচ্ছে । কিন্তু তা' সে লাভ করতে পারবে না । কারণ, তার সে ক্ষমতা নেই । নিজ কর্ম্মফলেই সে তা' হারিয়েছে । ঐশী-শক্তি অর্থাৎ ধারণপালনী আকূতির সাথে নিরন্তর যোগযুক্ততা আনে যোগ্যতা । এই যোগ্যতায় সে অধিরূঢ়, সে-ই ক্ষমতাবান, সে হ'য়ে ওঠে ক্ষমালাভের

অধিকারী। ক্ষম্-ধাতু মানে সামর্থ্য, যোগ্যতা। যোগ্যতা থেকে যে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে, সে সামর্থ্য হারা হ'য়ে ক্ষমা হ'তেও বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে ঐ গরীব লোকটিকে ঈশ্বর ক্ষমা করতে চাইলেও সে ক্ষমা পেতে পারবে না। এই সত্য না বুঝে ঈশ্বরকে পরীক্ষা বা বিচার করতে গেলে মূলে ভুল হ'য়ে যাবে না কি?

ঈশ্বরের পথে চলতে চাইলে বুদ্ধি ক'রে চলা যায় না। তাঁকে ভালোবাসতে হয়। প্রীতির পথেই তাকে বোধ করা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর নানা ভাবে বলেছেন, "ঈশ্বর চিরদিনই প্রীতিসুন্দর","ঈশ্বরই প্রীতি-অধ্যুষিত জীবনমন্ত্র"। এই প্রীতিরই ভূমায়িতরূপ হ'ল ভক্তি। ভক্তির মাধ্যমেই ভক্তের কাছে তিনি ধরা দেন। আবার পাই শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী– "ঈশ্বরই ভক্তবৎসল, ভক্তির আসনই ঈশ্বরের শ্বেত সিংহাসন, প্রণয়ই ঈশ্বরের পরম আলিঙ্গন", "অন্তরস্থিত ভক্তি তাঁর আসন"। প্রণয়-এর মধ্যে আছে প্র-নী ধাতু, অর্থ–প্রকৃষ্টভাবে যা' নিয়ে যায়। প্রীতির মধ্যেই আছে প্রকৃষ্টভাবে নিয়ে যাওয়ার কৌশল। আর, ভক্তির উৎপত্তি ভজ্ ধাতু থেকে, অর্থ–সেবা, অনুরাগ, অনুশীলন, উপভোগ। ঈশ্বরকে সেবা করতে হয়, তাঁর প্রতি অনুরক্ত হ'তে হয়, তাঁর বিধানের অনুশীলন করতে হয়, এই করার ফলে যে "শ্রমমুখর পরম-বিশ্রাম" লাভ হয় তাই হয় মানুষের উপভোগ্য। কিন্তু এই অব্যক্ত অমূর্ত ঈশ্বরকে কিভাবে ভালোবাসা ও সেবা করা সম্ভব, কিভাবে তাঁর বাণী পাওয়া যাবে, বোঝা যাবে তাঁর ইচ্ছা এবং তা' অনুশীলন করা যাবে, কিভাবে উপভোগ করা সম্ভব হবে যেন অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয় বিশ্বসত্তাকে? শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এর সমাধান বড় সুন্দর এবং বাস্তব। ঈশ্বরের কথা তিনি নানাভাবে বললেও অমূর্ত কাল্পনিক ঈশ্বরে মনোনিবেশ করার কথা বলেননি কখনও। তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী। তাই, ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়েও বাস্তব প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রেরিত প্রিয়পরমই ঈশ্বরের ব্যক্ত মূর্ত্তি", "ঈশ্বরই পরম আচার্য্য", "তিনিই ভূতমহেশ্বর"। বৈষ্ণব কবি বলেছেন, ঈশ্বরের সমস্ত লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। জগতের সমস্ত ভক্ত-সাধক এই সত্যই বারংবার ঘোষণা করেছেন। ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন মানুষেরই মাঝে, নররূপে লীলা করেন। অত্যাচারীত উৎপীড়িত ধরণীর আর্ত্ত আকুল বাঁচার আহ্বান ঘনীভূত হ'য়ে মহাত্রাণকর্ত্তারূপে আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। ঈশ্বর সত্তার মহাজাগরণ ঘটে ঐ ব্যক্তিত্বের মাঝে। "পরম পুরুষ" তিনি, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-পরিপূরণকারী শক্তিসম্পন্ন। যে-সৎ ও শিষ্ট চলনের অভাব মানুষকে ম্রিয়মান, ত্রস্ত দোধুক্ষিত ক'রে তোলে, তিনি সেই অভাব বিদূরিত ক'রে মানুষকে মহাশক্তিতে পরিপূরণ ক'রে থাকেন। এই ব্যক্তিত্ব তথাগত, অবতার বা প্রেরিত নামে অভিহিত হন। তথাগত–তথা (পরম উৎস) হইতে আগত, অবতার–ঈশ্বরের শক্তি নিয়ে যিনি অবতরণ করেছেন এবং প্রেরিত–ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত অথবা ঈশ্বর-অনুপ্রাণনায় (অনু)-প্রেরিত।

এই তথাগত, অবতার বা প্রেরিতগণই যুগগুরু, অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক, মানবকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, নির্ভরতার পরম অবলম্বন। ধর্ম্মনীতি বিকৃত অর্থে পরিবেশিত হ'তে থাকে, জীবনের মূল্য থেকে যখন আইন বা শাস্ত্রের মূল্য বড় হ'য়ে ওঠে, প্রবৃত্তির গর্ত্তে প'ড়ে মানুষ যখন স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টিকে অবহেলা ও উল্লঙ্ঘন ক'রে চলে, শিষ্ট মানসিকতা ও সদাচারী চলনের অভাবে মানুষ যখন নানাপ্রকার আধিব্যাধির কবলে যেয়ে পড়ে, দুর্নীতি ও দুরাচার যখন সমাজ ও রাষ্ট্রদেহের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বাসা বাঁধে, সুকেন্দ্রিকতার চিহ্নমাত্র যখন থাকে না এবং বিকেন্দ্রিকতাই যখন সহজ চলন হয়, শিশ্নোদরপূর্ত্তিই যখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন মানুষ যে কোন কার্য্যে নিঃসঙ্কোচে প্রবৃত্ত হ'তে পারে, শ্রদ্ধা-ভক্তি, মায়া-দয়া-প্রীতি-পরার্থ-পরতা ইত্যাদি সদ্‌গুণগুলি যখন উপস্থিত হয় ও কেবল কথার কথাতেই পর্য্যবসিত হয়, সৎকথা যখন শুধুমাত্র পুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে, তার আচরণ কোথাও দেখা যায় না, শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-গবেষণা-বিচার-শাসন যখন মানুষের সাত্বত-কল্যাণসাধন ক'রে না, সুষ্ঠু বিবাহনীতি অবহেলিত হওয়ার ফলে যখন অপধ্বংস-জাতকে দেশ ভ'রে যায়, দারিদ্র্যব্যাধিক্লিষ্ট হ'য়ে সমগ্র জাতটা যখন নানাবিধ সমস্যায় জর্জ্জরিত হয় এবং একটা হতাশ অবসন্নতায় ধুঁকতে থাকে, একটা ব্যাপার অন্ধ জ্বালাময়তা যখন সব দিক দিয়ে ঘিরে ধরে, তখন আর্ত্ত মানব বাঁচার জন্য আকুল হ'য়ে 'ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি' চীৎকার করতে থাকে। তাদের ঐ সম্মিলিত সংগ্রথিত জীবন কামনা ধরণীর বুকে নেমে আসে তথাগত, অবতার বা প্রেরিতের রূপ পরিগ্রহ ক'রে। এমন মানুষ দেশকাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সবার জন্যেই আসেন। সকলেই তাঁর কাছ থেকে সাত্বত পরিপূরণ পায়। এমন মানুষকেই ভালোবাসা যায়, সেবা করা যায় ; তাঁর বাণী পাওয়া যায় এবং তা' অনুশীলন ক'রে জীবন সার্থক ক'রে তোলা যায়। এঁরাই জগতের আলো। এদের সংস্পর্শেই জীবন স্বাদু ও মধুময় হ'য়ে ওঠে। এমনতর মানুষই ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। তাই, এদের মাধ্যম ছাড়া ঈশ্বর-উপলব্ধি অসম্ভব। এঁরাই

মর্ত্ত্যভূমিতে ব্যক্ত ঈশ্বর। ঈশ্বরীয় গুণাবলী সমস্তই এঁদের মধ্যে প্রকট থাকে। যে যত অনুরাগ-সহকারে তথাগতের সেবা ক'রে, তাঁর নির্দ্দেশমত নিজের জীবন পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সর্ব্বতোভাবে তাঁর তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা ক'রে চলে, তার কাছেই ঐ মূর্ত্ত ঈশ্বর স্বরূপতঃ ধরা পড়েন। যে এমন ভজনা ক'রে তাঁকে উপলব্ধি ক'রে, ভক্ত সে-ই।

ঈশ্বর অনন্ত অসীম। কিন্তু মানুষরূপে তিনি সান্ত ও সসীম। কিন্তু এই সসীম অবস্থাতেও তিনি সর্ব্বদাই সেই অসীম অনন্ত ভাবভূমিতে বিরাজমান। ঐ ভাবভূমিতে তিনি চির-অচ্যুত। তন্ত্রে আছে, তাঁতে সাধারণ মনুষ্যবোধ আরোপ করা মহাপাপ। মানুষরূপে সাধারণ মানুষের মত তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আহার-নিদ্রা দেখে অজ্ঞ মূঢ়জন তাঁকে সাধারণ মানুষ ব'লেই ভুল ক'রে। প্রবৃত্তি-অন্ধতা থাকার দরুন তারা পরমপুরুষের ভূতমহেশ্বর ভাব অবগত হতে পারে না। ফলে তাদের আচরণও তাঁর প্রতি হয় সাধারণ স্তরের মানুষেরই মতন। কিন্তু যদি কেউ তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর খুশির জন্য সমস্ত প্রবৃত্তির আকর্ষণ হেলায় উপেক্ষা করতে পারে, সে ঐ সসীমের মধ্যেই অনন্ত অসীম সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে, তাঁর সেই পরভাব ভূতমহেশ্বরত্ব আর তার কাছে আবৃত থাকে না। সে বুঝতে পারে যে, তার গুরুই স্বয়ং পরমেশ্বর, তার নামই জগন্নাথ। এই বৃত্তিভেদী টান যখন মানুষের জীবনে সহজ ও স্বতঃ হয়ে ওঠে তখন সে তার ইষ্টদেবের ভিতরেই বিশ্বরূপ দর্শন করে।

এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের ঐ সসীম শরীরী প্রতিমূর্ত্তির ভজন, পূজন, আরাধনা ও উপাসনা করলে তা' ঈশ্বরকেই করা হয়। হওয়ায় ভাসা অবাস্তব অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরনামধেয় কোন-কিছুর উপাসনা করলে তা'হয় না। কারণ, সেখানে কোন মানুষকে ভালোবেসে তার খুশি ও তৃপ্তির জন্য নিজের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্ন থাকে না। খেয়ালমত ঈশ্বরভজনার জন্য অনেক প্রবৃত্তি অনিয়ন্ত্রিত থেকে যায়। সেখানে পূজার বেলায় 'আমার ঈশ্বরকে' অর্থাৎ আমার মনের মাধুরী দিয়ে গড়া ঈশ্বরকে পূজা করি, 'ঈশ্বরের আমি' হয়ে উঠি না, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যে এপ্রান্ত ও প্রান্তের মত, তা' সহজেই বোঝা যায়। একটিকে আমি যেমন চাই, সেই ভাবে ঈশ্বরকে সাজিয়ে নিয়ে থাকি; অপরটিতে আছে নিজের সমস্ত পছন্দ-অপছন্দকে বিসর্জ্জন দিয়ে নররূপী ব্যক্ত ঈশ্বরের সেবা পূজা করা ও তাঁরই জন্য তাঁর মনের মতন হ'য়ে ওঠা।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আমাদের গন্তব্য নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গন্তব্য ঈশ্বর-প্রাপ্তি। কিন্তু এই গন্তব্য পথে মনগড়া রকমে এগোবার কথা নেই। সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছেন তিনি– এর জন্য চাই আচার্য্যে সক্রিয় অনুরতি। আচার্য্য স্বয়ং তিনি। কিন্তু তাতে এ অনুরতি অর্থাৎ অনুরাগ নিষ্ক্রিয় হ'লে চলবে না, সক্রিয় প্রীতি চাই। তাঁর সেবা ও পূজার জন্য দৈনন্দিন বাস্তবে করা চাই, আর চাই তাঁর চাহিদামতন নিজের জীবনটাকে সাজিয়ে তোলা। আবার, শুধু নিজে হ'য়ে উঠলেই হবে না, পরিবার ও পরিবেশকেও অমনতর ক'রে ঈশ্বরসেবানিরত, তন্মুখী ও তদ্‌ভাবাবিষিক্ত ক'রে তুলতে হবে। কারণ, পরিবেশ বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে ও চলতে পারি না। ঐ-রকম হ'য়ে ওঠার ভিতরেই আছে সেই আনন্দস্বরূপ পরিপূর্ণ সত্তাকে পূর্ণভাবে উপভোগ ক'রে বিস্তার ছড়িয়ে পড়ার মহাসুখ, "তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ মহাচেতনসমুত্থান।"

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান–

E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

শোনা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে– 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' আমি কোনোমতেই ভুলতে পারছি নে–

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে ।
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী-মাঝে
কাজল ঘন-মাঝে নিশি-আঁধার মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীণারণন শুনি যে–
প্রেমে প্রেমে বাজে ।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে'। এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়–আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে। বাতাসে তখন ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ সুন্দর করে খেলিয়ে ওঠে তখন তাদের সেই আশ্চর্য মিলন এবং সৌন্দর্যকে আমাদের চোখ দেখতে পায় না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হয়ে প্রকাশ পায়। আবার আকাশের মধ্যে যখন আলোর ঢেউ ধারায় ধারায় বিচিত্র তালে নৃত্য করতে থাকে তখন সেই অপরূপ লীলার কোনো খবর আমাদের কান পায় না, চোখের মধ্যে সেইটে রূপ হয়ে দেখা দেয়। যদি এই মহাকাশের লীলাকেও আমরা কানের সিংহদ্বার দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তা হলে বিশ্ববীণার এই ঝংকারকে আমরা গান বলেও চিনতে পারতুম।

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্বগানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয়–চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, নাক দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।

এই বিশ্বের অনেকখানিকেই যদিও আমরা চোখে দিখি, কানে শুনি নে, তবুও বহুকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলেছেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতায়াতকে নক্ষত্রলোকের গান বলেই বর্ণনা করেছেন। কবিরা বিশ্বভুবনের রূপবিন্যাসের সঙ্গে চিত্রকলার উপমা অতি অল্পই দিয়েছেন তার একটা কারণ, বিশ্বের মধ্যে নিয়ত একটা গতির চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু শুধু তাই নয়–এর মধ্যে গভীরতর একটা কারণ আছে।

ছবি যে আঁকে তার পট চাই, তুলি চাই, রঙ চাই, তার বাইরের আয়োজন অনেক। তার পরে সে যখন আঁকতে থাকে তখন তার আরম্ভের রেখাতে সমস্ত ছবির আনন্দ দেখা যায় না–অনেক রেখা এবং অনেক বর্ণ মিললে পর তবেই পরিণামের আভাস পাওয়া যায়। তার পরে, আঁকা হয়ে গেলে চিত্রকর চলে গেলেও সে ছবি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে–চিত্রকরের সঙ্গে তার আর কোনো একান্ত সম্বন্ধ থাকে না।

কিন্তু, যে গান করে গানের সমস্ত আয়োজন তার নিজেরই মধ্যে–আনন্দ যার, সুর তারই, কথাও তার–কোনোটাই বাইরের নয়। হৃদয় যেন একেবারে অব্যবহিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, কোনো উপকরণের ব্যবধানও তার নেই। এইজন্যে গান যদিচ একটা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা রাখে তবু তার প্রত্যেক অসম্পূর্ণ সুরটিও হৃদয়কে যেন প্রকাশ করতে থাকে। হৃদয়ের এই প্রকাশে শুধু যে উপকরণের ব্যবধান নেই তা নয়–কথা জিনিসটাও একটা ব্যবধান–ভেবে তার অর্থ বুঝতে হয়–গানে সেই অর্থ বোঝবারও প্রয়োজন নেই, কোনো অর্থ না থাকলেও কেবলমাত্র সুরই যা বলবার তা অনির্বচনীয়-রকম করে বলে। তার পরে আবার গানের সঙ্গে গায়কের এক মুহূর্তও বিচ্ছেদ গান নেই–গান ফেলে রেখে গায়ক চলে গেলে গানও তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়। গায়কের প্রাণের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে, গানের সুর একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়। যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যত্যয় নেই।

এই বিশ্বসংগীতটিও তার গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে

তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিশ্বাসে তাঁরই আনন্দরূপ ধরে উঠছে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে অথচ ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরেই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব–এক সুরকে আর-এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যখন কোনো বচনগম্য অর্থও না পাই তখনও আমাদের চিত্তের কাছে এর প্রকাশ কোনো বাধা পায় না। এ যে চিত্তের কাছে চিত্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ, তাঁর তেজ, তাঁর শক্তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।

কাল কৃষ্ণা একাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীণকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম; সেই ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে গাঁথা পড়ছিল। তার পরে যখন শুনতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে, আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনও সেই জাগ্রত বীণকারের নিশীথরাত্রের বীণা বন্ধ হবে না–তখনও তাঁর যে ঝংকারের তালে নক্ষত্রমণ্ডলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রানিভৃত দেহনাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থামবে না, সর্বাঙ্গে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ লক্ষ জীবকোষ আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্কসভার সংগীতচ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাকবে।

'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' আবার, আমাদের ওস্তাদজি আমাদের হাতেও একটি করে ছোটো বীণা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে আমরাও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে শিখি। তাঁর সভায় তাঁরই সঙ্গে বসে আমরা একটু একটু সংগীত করব, এই তাঁর স্নেহের অভিপ্রায়। জীবনের বীণাটি ছোটো, কিন্তু এতে কত তারই চড়িয়েছেন। সব তারগুলি সুরমিলিয়ে বাঁধা কি কম কথা! এটা হয় তো ওটা হয় না, মন যদি হল তো আবার শরীর বাদী হয়, একদিন যদি হল তো আবার আর-একদিন তার নেবে যায়। কিন্তু, ছাড়লে চলবে না। একদিন তাঁর মুখ থেকে এ কথাটি শুনতে হবে–'বাহবা, পুত্র, বেশ।' এই জীবনের বাণীটি একদিন তাঁর পায়ের কাছে 'গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া' তার সব রাগিণীটি বাজিয়ে তুলবে। এখন কেবল এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই–ঢিল দিলেই ঝন্‌ঝন্ খন্‌খন্ করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মুক্তও রাখতে হবে–তার উপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধুলো না পড়ে, মরচে না পড়ে–আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা কোরো, 'হে আমার গুরু তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।'

যখন নারীর মাঝে–
সব প্রবৃত্তি সংহত হ'য়ে রাজে,
দয়িতের তার বাঁচা ও বাড়ার
উচ্ছলতার কাজে;
আপন ভোগের সকল কামনা
হ'য়ে যায় তিরোহিত,
প্রিয়তম লাগি হতাশারে ভুলে,
আশা রয় জাগরিত,
শ্রম করে ত্রাণ বিশ্রাম হতে
পুলক শেখায় যাতনা ভুলিতে,
মৃত্যু লঙ্ঘি' জীবন চেতনা
চিরদিন জেগে রয়,
প্রাণের গভীরে নিভৃতে নিরালায়,
মুগ্ধ দু'চোখে চায় সে প্রিয়ের পানে,
অজ্ঞাতসারে দীপ্ত সে হয়
সেবায়, প্রেমে ও প্রাণে;
সুন্দর এক সেবাময় গতি নিয়ে
সতীত্ব সে জেগে রয় সেইখানে!

–শ্রীশ্রীঠাকুর

আমি তোমাকে ভালবাসি

জগদীশ দেবনাথ

(চার)

ঠাকুরকে ভালবাসার প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তাঁর প্রতি অটুট, অচ্ছেদ্য আনুগত্য ও প্রশ্নশূন্য টান। প্রার্থনায়, ভক্তিগীতিতে আমাদের চাওয়ার দিকটাই মুখ্য থাকে। এটা দাও, ওটা দাও, সুস্থ-সুদীর্ঘ প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা নিরুদ্বিগ্ন জীবনের আর্তিই নীরব প্রার্থনায় অনুষঙ্গ হয়ে উঠে। চাওয়ার বালাই যে মানুষকে পাওয়ার পরিতৃপ্তিতে অঢেল করে না বা করতে পারে না– সে বিজ্ঞান আমরা প্রায়শঃ ভুলে যাই। তাঁর দয়া ভিন্ন কোন কিছুতে সফল হওয়া যায় না। এই দয়া বা কৃপাও পেতে হয় বিধিমাফিক কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করেই। করা ভিন্ন (যোগ্য) হওয়া যায় না, (যোগ্য) না হয়ে উঠলে পাওয়া সুদূরপরাহত। মহাভারতের মঙ্গলাচরণ স্তোত্রের একস্থানে আছে–

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥'

যাঁর কৃপায় মূক মুখর হয়, পঙ্গু পাহাড় পাড়ি দেয় সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি। এই মাধব বা ঠাকুরকে বন্দনা করি মানে তাঁর দেওয়া অনুশাসন বা চলন মেনে চলি। 'বন্দনা' শব্দটির অর্থ ব্যঞ্জনায় আছে– পূজা, স্তব, প্রণাম ইত্যাদি। এই শব্দত্রয়ের অর্থ বিশ্লেষণে মাধব বা ঠাকুরের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন নিনড় টানের কথাই উঠে আসে। 'যাঁকে পূজা করছি, তাঁকে আমার ভিতরে সংবর্ধিত করে তোলাই প্রকৃত পূজা অর্থাৎ তাঁর গুণাবলী আমার মধ্যে বাড়িয়ে তোলা।' 'স্তব' শব্দের ব্যাখ্যায় আছে স্তুতি, ভাল থাকা, ভালো থাকানো ইত্যাদি।' দ্রষ্টব্যঃ বাগর্থদীপিকা– দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আর প্রণাম শব্দটিতেও প্রকৃষ্টভাবে নত হওয়ার কথা আছে। যাঁকে আমি গভীর ভাবে ভালবাসি তাঁর গুণাবলীই তো আমার চরিত্রে ধারণ করতে চাইব, তাঁর স্তুতিই তো করব, যাতে আমি ভাল থাকি, তাঁর কাছেই তো আমি প্রকৃষ্টভাবে নত হব। কাজেই, ঠাকুর বা ঈপ্সিত প্রিয়পরমের চলন বা নীতিবিধি চরিত্রে, কর্মে ধারণ বা বাস্তবায়নের নৈষ্ঠিক টান বা স্পৃহাকেই বলে ভালবাসা। আদর্শের বলামাফিক জীবন পরিচালিত হলেই তাঁর ভালতে বাস করা হয়। তিনি খুশি বা প্রীত হন। তাঁর প্রীতিই আমার জীবনের অর্ঘ্যনীয় বস্তু। শ্রীশ্রীঠাকুর ১৬/২/৪৮ খ্রিঃ তারিখে আলোচনায় হঠাৎ আপনমনে বলে উঠলেন– 'ভালবাসা হল The only prop of men's life (মানুষের একমাত্র অবলম্বন)। তাছাড়া মানুষের existence (অস্তিত্ব)-ই টিকতে পারে না। খুব বীভৎস মানুষ যে, সেও কাউকে হয়তো ভালবাসে।' আলোচনা-প্রসঙ্গে, ১১ খণ্ড।

কোন কিছু পাওয়ার আশা না রেখে অবিচল নিষ্ঠায় তাঁর দেয়া বিধান মেনে চলাই নিনড় ভালবাসার মানদণ্ড। আর, এ কাজ করতে গিয়ে যত বিপদাপদ, অসুখ-অসুবিধাই আসুক, তা' নিয়ন্ত্রণ করে যেতে হয় অম্লান প্রচেষ্টায়। ক্লেশকে সুখে প্রতিপন্ন করার অবিচল নিষ্ঠার নাম ভালবাসা। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, 'যার কাছ থেকে আমরা কেবল নিতে চাই, পেতে চাই, তার উপর আমাদের কোন টান গজায় না। ওতে ভালবাসা শুকিয়ে ওঠে। প্রত্যাশাহীন হয়ে যাকে যত দেওয়া যায়, যার যত পালন-পোষণ করা যায়, তার উপর তত টান বাড়ে।' প্রাগুক্ত তারিখ– ২১/৩/৪৮ খ্রিঃ। তাঁর সহজ ছড়াবাণীতে আছে,– 'ইষ্টের থেকে নিও না কিছু/ দিওই তারে যত পার/ নেওয়ায় বাড়ে স্বার্থবুদ্ধি/ দেওয়ায় প্রীতি হয়ই গাঢ়'। শ্রীশ্রীঠাকুর।

পূর্বেই বলেছি, মানুষ হিসাবে আমাদের নানা চাওয়া-পাওয়ার বালাই থাকেই। সাধ্যমত করণীয় পালনের পরও প্রতিকূলতায় পড়ে হাবুডুবু খাই। নাম-ধ্যানের ক্ষেত্রেও এ কথা চলে। কোন কোন সময় নাম-ধ্যানে প্রাণ–প্রাচুর্য উছল হয়ে উঠে। আবার কখনো তা' স্তিমিত হয়ে কেটে কেটে যেতে থাকে। নামধ্যান পরায়ণ থাকলেই তো ভালবাসার টানটি সজাগ থাকে। মনের এই উঠানামায় করণীয় সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদা ও ফেনদার সঙ্গে আলোচনায় বলেন,–'এ যেন wave (ঢেউ)-এর মত। ওঠার সঙ্গে নামা আছে, নামার সঙ্গে ওঠা আছে। ওঠানামা একসঙ্গে চলে। ওর জন্য ভাবতে নেই। দেখতে হয় উঠতি-পড়তি সবটার সঙ্গে সবটার মধ্যে যেন আমার Lord (প্রভু) আমার মধ্যে unaffected (অব্যাহত) থাকেন। তিনি যদি আমার মধ্যে চিরজাগ্রত থাকেন, তবে আমাকে আর ঠেকায় কে? তাঁর জন্যই তো আমি, তাঁর জন্যই তো আমার যা-কিছু সব। দুঃখের মধ্যেও যদি তাঁকে বুকে করে নিঝুম হয়ে থাকতে পারি, সেই তো আমার পরম সুখ। কোন অবস্থায় লহমার জন্যও যেন আমরা তাঁকে না ভুলি, অন্য কিছু যেন আমাদের মনকে পেয়ে না বসে। এই steady unrepelling love (এই চির অচ্যুত ভালবাসা) টুকুই আমাদের সম্বল। অনেকের টান যেন হাউইবাজীর মত, খুব চোখধাঁধান জেল্লা নিয়ে ঠেলে উঠে একটু পরেই ফুসফাস। ঠিক যেন মাতালের উল্লাস। তা' স্থায়ী হয় না, উল্লাসের পরে আসে প্রচণ্ডঅবসাদ। তা' তাড়ানোর জন্য আবার মদের আশ্রয় নিতে হয়। টনিকে কিন্তু তা' হয় না। তা' শরীরকে পুষ্ট করে, মনকে প্রফুল্ল করে, কিন্তু কোন undesireable reaction (অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া) আনে না। আমার মনে হয় ইষ্টনিষ্ঠাই হল সেই universal

tonic (সার্বজনীন বলকারক ওষুধ) যা' আমাদের অস্তিত্বকে সব রকম ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও বিপর্যয়ের মধ্যে ধরে রাখে। এতে চোখ ঝলসায় না, কিন্তু প্রাণ জুড়ায়।' আলোচনা–প্রসঙ্গে, ১১–খণ্ড, তারিখ–২০/৫/৪৮ খ্রি.।

ভক্তের ইষ্টটানের রকম বা নেশাটি কেমনতর হবে তা উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে। সর্বদা প্রতি কাজে তাঁকে মুখ্য বা রক্ষা করে চলার নিদেশ আছে। তাঁকে রক্ষা করে চলার প্রধান তুকই হচ্ছে ভালবাসা। তাঁর চেয়ে বড় বা আপন এ জগতে আমার আর কেউ নেই। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকটি উল্লেখ করেন।

'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥'
শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৮/৬৬

অতঃপর তিনি বলেন, 'ও বড় জবর কথা। এর তাৎপর্য হল এই যে, তোমার বৃত্তিধর্মই থাক আর যাই থাক সব-কিছুকে উপেক্ষা করে তোমার চরিত্র, তোমার চলন, তোমার বলন, তোমার ব্যবহার, তোমার বুদ্ধি সবই যেন সর্বদা আমাকে protect (রক্ষা) করে চলে। ফলকথা তুমি সব কিছু sacrifice (ত্যাগ) করতে পার, কিন্তু আমাকে কখনো sacrifice (ত্যাগ) করো না। এতেই তুমি সব পাপ থেকে ত্রাণ পেয়ে যাবে। এই হল শান্তির পথ, মুক্তির পথ। এই সহজ তুকটি যে জীবনের প্রতি-পদক্ষেপে প্রয়োগ করে চলতে পারে, তার আর ভাবনার কিছু নেই। এইটুকুই হল তাঁকে ভালবাসার মোক্ষম পরিচয়। একটু থেমে আবার বলে চললেন– ভালবাসা পুরুষাকারে ভরা। ভালবাসায় কাপুরুষতা নেইকো। কাপুরুষতা আছে lust-এ (কামে), love-এ (ভালবাসায়) নয়। ..... আমি যদি কোন মানুষকে প্রধান করে না ধরে কোন-কিছু পাওয়ার জন্য তাঁকে ভালবাসি বলে দেখাই, সেইটাই lust (কাম)। এটা শুধু lust (কাম) নয়, hypocrisy (কপটতা)-ও বটে। এই রকমটাই তথাকথিত প্রেমিক ও প্রিয় উভয়ের পক্ষেই অস্বস্তিকর, শুধু অস্বস্তিকর নয়, অপমানকরও বটে' আলোচনা-প্রসঙ্গে, ১২-খণ্ড, তারিখ–৮/৭/৪৮ খ্রি.।

আবার পূর্বোক্ত শ্লোকটিতে 'সর্ব ধর্ম' মানে কী তা' বোঝাতে গিয়ে দয়াল বলেছেন– 'কামের ধর্ম, ক্রোধের ধর্ম, লোভের ধর্ম, অহংকারের ধর্ম, মাৎসর্য্যের ধর্ম, প্রচলিত সংস্কারের ধর্ম, প্রত্যেকের মনগড়া ধর্ম, ত্যাগের ধর্ম, ভোগের ধর্ম, কৃচ্ছ্রতার ধর্ম, অর্থ-মান-যশের ধর্ম-এর কি কিছু ইয়াত্তা আছে? তাই এক কথায় বলেছেন সর্ব ধর্ম। তুমি এই সব কিছুকে sacrifice (ত্যাগ) করতে পার কিন্তু not me (আমাকে নয়)। আমাকে যদি রাখো, জীবনের জন্য, বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃত উপভোগের জন্য যা তোমার প্রয়োজন সবই অক্ষত থাকবে। আমাকে যদি না রাখো, তুমি যাই পাও আর যাই ধরে রাখো, সবই তোমার কাল হয়ে দাঁড়াবে। তোমার অস্তিত্বই একদিন বিপন্ন হয়ে পড়বে।' প্রাগুক্ত।

ভক্তের ভালবাসা বা ইষ্টটানটি যেন এমন পর্যায়ের হয়, যাতে মানুষ তার সংস্পর্শে এসে প্রাণ-প্রদীপ্ত হয়, ভরসা পায়। বিপদে হাবুডুবু খাচ্ছে যে, সে ভক্তজনের পরশে বল-ভরসায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। এই রকম ভরসাস্থল হতে গেলে চাই চলন চরিত্র ঠাকুরমুখী হওয়া। মন্দের প্রশ্রয় না দিলে মন্দ এসে জুটলেও যেমন খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না, তেমনি মন্দকে শুভে নিয়ন্ত্রণের প্রাণপন প্রচেষ্টাই মানুষকে যথার্থ যোগ্য ও আস্থাশীল ব্যক্তিত্বে উন্নীত করে। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন উপস্থিত জনৈক দাদাকে লক্ষ্য করে বললেন– 'ওকে যেদিন দেখব, ও তার দলের মধ্যে পড়ে দলের কাছে yiuld (নতিস্বীকার) করছে না ; তাদের mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারছে, সেদিন বুঝব ওর কিছু হয়েছে। মদের টেবিলে ২৫ জন হয়ত বসেছে, সকলকে মদ দিচ্ছে। সকলেই মদ খাচ্ছে। ও বসে আছে, মদ খাচ্ছে না, কিন্তু তারা মদ খাওয়ার সময় ওর ঈশ্বরীয় কথার মদ এমনভাবে দিচ্ছে যে, তাদের মদের নেশা ছুটে যেয়ে ওর কথার মদের নেশা তাদের পেয়ে বসেছে। তারা ঐ দিকেই ঝুঁকে পড়ছে। সত্যিকথা বলতে কি ইষ্টনেশার মত এমন জীবনীয় নেশা আর হয় না।' দ্রষ্টব্যঃ-আলোচনা–প্রসঙ্গে, ১৩ খণ্ড, তারিখ–২৬/৭/৪৮ খ্রি.।

তবে, যাজনে মদাশক্তির অভ্যাসের মোড় সুপথে ঘুরিয়ে দেয়ার মত চরিত্রবল, অটুট ইষ্টনিষ্ঠা এবং অম্লান প্রচেষ্টাতেই কেবল অর্জন সম্ভব হতে পারে। একমাত্র তাঁর দয়া হলেই এমন সুকৃতী লাভ করা যায়। সে কারণে অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে নির্বিচারে ইষ্টের আদেশ পালন ভিন্ন গত্যন্তর নেই। একটি প্রায়োগিক জীবন কৌশলের অপর নামই অনুকূল-দর্শন। এ দর্শন-জাত প্রতিটি কথা কাজে পরিণত করে বা চরিত্রগত করেই শুধু কাঙ্খিত ফল অর্জন করা যায়। চলমান বিরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আমরা প্রায়শই খুশি বা সন্তুষ্ট থাকতে অভ্যস্ত নই। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন আপনমনে বলছিলেন,– 'আমরা যে কি চাই, তাই-ই জানি না। তাই পরমপিতার শত দয়া সত্ত্বেও সন্তোষের সন্ধান কমই পাই জীবনে।' প্রফুল্লদা এর প্রতিকার কী জানতে চাইলে দয়াল বলেন,– 'ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমাদের চাইবারও আর কিছু নেই, করবারও আর কিছু নেই। তাই সব অবস্থায় নামপরায়ণ থেকে মন ও মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে দেখতে হয় এই অবস্থার মধ্যে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য কী করা যায়, আর সাধ্যমত তাই করতে হয়। তখন মনে প্রাণে বোধ করা যায় একমাত্র পরমপিতাই আছেন আমাদের জীবনে নানাভাবে, নানারূপে। আত্মসমর্পণ তখন আপসে আপ এসে পড়ে। দুশ্চিন্তা ও অশান্তি তখন আমাদের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসতে পারে না।' অতঃপর একই দিনে 'অনুরাগে প্রবৃত্তিগুলি কেন্দ্রানত' হওয়া বিষয়ক একটা লেখা (শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত)

প্রফুল্লদাকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন– 'যেমন ধর মাছ খাব না– এ কথায় সাধারণ মানুষের মাথা ঘুরে যায়– মাছ না খেয়ে থাকব কি করে? কিন্তু ঈপ্সিতে অনুরাগ থাকলে মাছ ছাড়ে এক লহমায়, আর তা' হাসিমুখে। অনবরত তার মনের মধ্যে নিরখ-পরখ চলে– তার বাঞ্ছিতের বিরোধী বা অপছন্দসই তার চরিত্রে কিছু আছে কি না, যেই দেখতে পায়, অক্লেশে তৎক্ষণাৎ তা' ছেড়ে দেয়, কারণ তার লোভ ঈপ্সিতে, ওতে নয়। ঈপ্সিত যা পছন্দ করেন, লোভ তাতেই, আর তাই সে সানন্দে করে। এটা general (সাধারণ), যে বিষয়েই অনুরাগ হোক, তাতেই এমন হবে। আফিং-এ অনুরাগ হলে আফিং বিষয়ে ওমনি হবে, আর ঈশ্বরে অনুরাগ হলে তাও তেমনি হবে। একটাতে আনে অবসান, আর একটায় আনে আসান। আফিং এ বেশি টান হলে অবসান, ঈশ্বরে টান যত হয়, তত আসান।' আলোচনা–প্রসঙ্গে, ১৩ খণ্ড, তারিখ–৪/৮/৪৮ খ্রি.।

মানুষ হিসাবে নানা বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়েই আমাদের জীবন। এই বৃত্তি-প্রবৃত্তির ঘানি যাতে টানতে না হয় সে জন্যই ইষ্টানুসরণ। বৃত্তি-প্রবৃত্তির অনুরাগ ইষ্টে সমর্পিত করতে গেলে প্রথমেই দরকার আদর্শে সম্যক দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষা নিয়ে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি সঠিক নিয়মে প্রতিপালন করতে করতে আসে তাঁর প্রতি বৃত্তিভেদী অনুরাগমুখর টান। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন– 'নিত্য সাধনা চাই। প্রথম জিনিস যজন। ভক্তির সঙ্গে ইষ্টের মনন, নাম, জপ, ধ্যান তাঁর নীতিবিধিগুলি পরিপালন করা, চরিত্রগত করা। এক কথায় নিজেকে ইষ্টের ভাবে ভাবিত, অনুরঞ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করাই যজন। যাজন মানে সেবা–সাহচর্য্য-বাক্য-ব্যবহারে অপরকে প্রবুদ্ধ করে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপ্রাণ করে তোলা। নিজে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হলে কিন্তু অন্যের ভিতর এই ভাবটা সঞ্চারিত করা যায় না। ইষ্টভৃতি হল নিত্য অন্ন-জল গ্রহণের পূর্বে ইষ্টকে নিত্য বাস্তবে যথাসম্ভব নিবেদন করা। নিয়মিতভাবে তাঁকে দেওয়া ও করার ভিতর দিয়ে তাঁর উপর টান বাড়ে। দেশ ও দশকে জাগাতে গেলে আমাদের যাজনজৈত্র হতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটা চলা বলা যেন মানুষকে ইষ্টে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মানুষ হয় ঈশ্বরমুখী হবে, না হয় প্রবৃত্তিমুখী হবে। নিজেরা ঈশ্বরমুখী হওয়া ও অপরকে ঈশ্বরমুখী করে তোলাই মঙ্গলের পথ। এই-ই প্রত্যেকের করণীয়।' আলোচনা-প্রসঙ্গে ১৪ খণ্ড, তারিখ-১৫/১০/৪৮ খ্রি.।

ইষ্টকে ভালবেসে, তাঁর দেয়া নীতি-বিধি অস্খলিত নিষ্ঠায় ও দৃঢ় প্রত্যয়ে হৃদয়ে, চরিত্রে ধারণ করে চললেই তাঁর দয়া অনুভব করা যায়। ইষ্টকাজ অভ্যাসে চারিয়ে গেলে তা করার জন্য আর কসরত করতে হয় না। মনের স্বতঃটানেই তখন বাঞ্ছিতের বলাগুলি ভক্তের অধিগত বা করায়ত্ত হয়। সুধীরদা নামক জনৈক ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভালবাসা জোর করে হয় কি না। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন– 'ভালবাসলে ভালবাসা হয়। তার মধ্যে থাকে ভালবাসা ও পছন্দও সেই অনুয়ায়ী করা। কারও জন্য করতে-করতে আবার তাঁকে পছন্দ করি, ভাললাগা ও ভালবাসা গজায়। আপনজনের উপর ভালবাসাটাও এইভাবে হয়। ভালবাসলে যেমনভাবে, বলে ও করে, তেমন ভাবা, বলা ও করাটাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি।' সুধীরদা আবারো জিজ্ঞেস করেছিলেন, ' ইষ্টকে ভালবাসি, না নিজের স্বার্থ ভালবাসি বোঝা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন– 'ইষ্টার্থ যখন কারও নিজের স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়, তখনই সে ইষ্টপ্রাণ হয়। আর যতক্ষণ তার কামনাপূরণের জন্য ইষ্ট, ততক্ষণ সে আর্ত বা অর্থার্থী থাকে।' প্রাগুক্ত। ইষ্টকাজকে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বিবেচনা না করা অরিষ্টলক্ষণ। কারণ এতে বিধির দয়া অনুভবে ব্যতিক্রম ঘটে। প্রশান্তির সুশীতল আবহ হাহাকারের রিক্ত ও নিঃস্ব বেদনায় পর্যবসিত হয়।

'৩/১১/১৯৪৮ খ্রিঃ তারিখ। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল বাংলোর বারান্দায় বসা। পূজনীয় বড়দা, কাজলদা ও অশোকদা আছেন। অন্য অনেকেও উপস্থিত। বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরকে খুব সাবধানে থাকতে বললেন যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন– ওর সব সময় বুদ্ধি কিসে আমি ভাল থাকি। ভালবাসার এ একটা প্রধান লক্ষণ। শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকদা ও কাজলদাকে জোর দিয়ে পড়াশুনো করার কথা বললেন। সেই সঙ্গে বললেন– তোমাদের অনেক বড় কাজ করতে হবে। তার জন্য এখন থেকে সব দিক দিয়ে তৈরী হওয়া লাগে।' দ্রষ্টব্যঃ আলোচনা প্রসঙ্গে-১৪ খণ্ড।

ঔরসজাত কিংবা কৃষ্টিজাত সন্তান-সন্ততি সবার জন্যই ঠাকুরের এমন আশা, প্রাণ–মাতানো তাগাদা কিংবা উদ্বিগ্নতা ছিল বরাবরের। '....শিষ্য ও সন্তান– বড় খোকাই হোক, মণিই হোক বা কাজলই হোক বা আপনারাই হোন– আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমি আশা করি যে আপনারা নিজেদের জীবনে ও চরিত্রে আমাকে বহন করে নিয়ে বেড়াবেন এবং অন্যের কাছেও আমাকে পৌঁছে দেবেন– অবিকৃতভাবে, অবশ্য প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। আর, আমাকে বহন করা ও পৌঁছে দেওয়া মানে, আমার mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য)- কে বহন করা ও পৌঁছে দেওয়া, আর আমার mission মানে সকলের mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য) জীবনীয় প্রতিটি যা কিছুর ইস্টষ্টানুগ সত্তাসম্বর্ধনাই আমার mission।' আলোচনা-প্রসঙ্গে, তৃতীয় খণ্ড, তারিখ–১৭/১/৪২ খ্রিঃ।

তাঁর কাজ যথাসময়ের যথার্থভাবে নিষ্পন্ন করেই শুধু তাঁকে সুখী বা নিরুদ্বিগ্ন রাখা যেতে পারে। আর, এমনটি করাই ভক্ত জীবনের চরম সার্থকতা। ঠাকুরকে যে ভালবাসে, প্রকৃত ভক্ত যে, তার সংস্পর্শে গেলে ইষ্টানুভূতির রেশ পাওয়া যায়। মণিদার সাথে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় শ্রীশ্রীঠাকুর এক স্থানে বলেছেন– '..... ভক্ত তার সমস্ত সত্তা দিয়ে

ইষ্টসেবায় বিভোর হয়ে থাকতে চায় । এর মধ্যে একটা সানুকম্পী সঙ্গতি থাকে । ইষ্টের চলা, বলা, বোধ ও অনুভবের একটা অনুকম্পন স্পষ্টতঃ টের পাওয়া যায় ভক্তের সংস্পর্শে এলে । এটা অবশ্য প্রত্যেকের ভিতর বোধ করা যায় তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী । ভক্তকে দেখলে তার উপাস্যের স্মৃতির উদ্দীপন হয়-ই কি হয় । তার কারণ, তার অস্তিত্বটা প্রেষ্ঠের পরিপোষণ, পরিপূরণ, পরিরক্ষণ নিয়ে ব্যাপৃত থাকে । ভক্ত চায় ইষ্টের ইচ্ছাগুলি নিজের জীবন দিয়ে পরিপূরণ করতে । স্বভাবতই তার মধ্যে সর্বজীবের প্রতি শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির ভাব প্রবল হয়ে ওঠে । সে চায়– সবাই বেঁচে থাক, পুষ্ট হোক, তুষ্ট হোক । কারণ, তাতে সত্ত্বারূপী প্রিয়পরম খুশি হন । ভালবাসি খুব, অথচ তদনুযায়ী motor action (কর্মপ্রবোধী স্নায়ু ক্রিয়া) নেই, তার মানে সেখানে ভালবাসাই নেই । বউ, ছেলেপেলে যাদের ভালবাসি, তাদের বেলায় কিন্তু কখনও inactive (নিষ্ক্রিয়) হয়ে বসে থাকি না । তাদের ভালর জন্য যা করণীয় বলে মাথায় আসে, তা বাস্তবে করতে লেগেই থাকি । ইষ্টের প্রতি ভালবাসা থাকলে আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ x, y, z যতরকম প্রবৃত্তিই থাক না কেন, সেগুলি তাতে কেন্দ্রায়িত হয়ে অন্বিত হয়ে উঠে । তখন সেগুলি আর রিপু থাকে না, মিত্র হয়ে যায় । সুকেন্দ্রিক হয়ে সেগুলি পোকাটা-মাকরটার পর্যন্ত ধারণ-পালনে সক্রিয় হয়– ইষ্টের প্রীত্যার্থে । এই যার মধ্যে যত হয়, তা' দেখে বোঝা যায় তার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্ব বা ঠাকুরত্ব তত জেগে উঠছে এবং সে ঈশ্বরলাভের পথে ততখানি অগ্রসর হচ্ছে । ইষ্টের চরিত্র স্ব-স্ব-বৈশিষ্ট্য–অনুযায়ী যার ভিতর যতখানি সক্রিয় স্ফুরণা লাভ করে, তা' দেখে বোঝা যায় তার ভিতর ভক্তি কতখানি জাগছে ।' আলোচনা-প্রসঙ্গে, ১৭ খণ্ড, তারিখ ৩/৫/৪৯ খ্রি. । আদর্শের দাঁড়ায় ফেলে যারা যথার্থ অর্থে নিজেকে তৈরী করেন তাদের ইষ্ট-নির্ভরতা কতটা দৃঢ় তা নিচের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় । শরৎদার ভক্ত হনুমান সম্পর্কীয় আলোচনার সূত্র ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন– 'যতীশ ঘোষ ছিল– মাথায় মস্ত টিকি ছিল, তাকে দেখে হনুমানের মত মনে হত । একবার অপারেশনের সময় আমাকে বলল– "আপনি কাছে থাকলে ক্লোরোফরম (চেতনা-নাশক) করা লাগবে না ।" আমি ছিলাম, ঐভাবে অপারেশন হয়ে গেল । অপারেশনের সময় চোখমুখের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখলাম না । শুধু এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়েছিল । তারপর আমি ওকে খুব নাম করতে বললাম ।' আলোচনা-প্রসঙ্গে ১৭খণ্ড ২৮/৫/৪৯ খ্রি. । পুরোপুরি সজাগ একজন রোগীকে কোন ধরণের ক্লোরোফরম (চেতনানাশক) না দিয়ে শরীর কেটে অপারেশন করা, রোগীর কোন ব্যথাবোধ না থাকা আপাত অবিশ্বাস্য মনে হলেও ব্যথাহারীর প্রতি অটুট, অচ্যুত, গভীর টানের জেল্লায় তা' সম্ভব । ঠাকুরের প্রতি যতীশদার ভালবাসার টান কতটা উঁচুগ্রামে বাঁধা থাকত এই ঘটনাই তা' প্রমাণ করে । গোপাল সাহা নামের একজন তখন ঠাকুরকে অপমান সূচক কথা বলেছে শুনে রাগে তাঁর চুলগুলো খাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি দা নিয়ে গোপাল সাহাকে কেটে ফেলার জন্য তিনদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে খুঁজে বেড়িয়েছেন । শেষে ঠাকুর খবর পেয়ে যখন তাকে বললেন– 'যে জীবন দিতে পার না সেই জীবন নেওয়ার কি অধিকার আছে তোমার?' ঠাকুরের একথা শুনে তিনি একেবারে পাগল হয়ে গেলেন, বলতে লাগলেন– 'ঠাকুর, আপনি আমাকে একেবারে খুন করে ফেললেন । আপনি যখন বারণ করেছেন তখন আর মারতে পারব না । কিন্তু আমি নিজে মারতে না পেরে মরার দাখিল হয়ে গেলাম । ওর মত পাপীকে মারলে কোন ক্ষতি হোত না । আপনার প্রতি অপমানে সায় দিয়ে আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ রইল না ।' প্রাগুক্ত ।

তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলেছেন– '.....বাইরে গেলে খালি হাতে আসত না । খুব সতর্ক–সন্ধানী ছিল । সবদিকে নজর ছিল । normally (স্বাভাবিকভাবে) সম্মান দিত সকলকে, –সে একজন বড় অফিসারই হোক বা একজন সামান্য কৃষকই হোক । সে নিজেও খুব ভালবাসত সকলকে । সে যে কী ছিল তার চরিত্রটাই বলে দিত । আমার কোন কথায় যেন বোঝাতে পারছি না । ঐ রকম মানুষ যখন ছিল তখনকার কথা মনে হলেই ভাবি, কি মহৎ দিনই চলে গেছে । .....আমাকে নানারকম জিনিস খাওয়াবার খুব প্রলোভন ছিল । আমাকে সরটর খাওয়াত । খুব সদাচারী ছিল ।' প্রাগুক্ত ।

বীর যতীশদা সম্পর্কে আরো উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তিজীবনে দরিদ্র থাকলেও নিজ অবস্থায় তিনি ছিলেন মহাখুশি । নিজেকে সুখী ভাবতেন । 'যার ঠাকুর আছে তার আর চাইবার কী থাকে' –এই ছিল তার ঠাকুরকে নিয়ে উপলব্ধি ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন– 'আমাকে ওর interest (স্বার্থ) করে নিয়েছিল । আমার জেতা ওর জেতা । আমার লোকসান ওর লোকসান । আমার এতটুকু ক্ষতি সে সহ্য করতে পারত না । আমার প্রতি ভালবাসা, আমার প্রতি কারও নেশা এইটে সে খুব পছন্দ করত । মানুষের পিছনে লেগে থেকে খুব সেবা দিত ।' প্রাগুক্ত । ভক্ত-চরিত্র কেমন হওয়া উচিত, প্রিয়পরমকে ভালবাসার মানদণ্ড কেমনতর বা কতটা উঁচুমাপের তা' যতীশদার জীবনের দুই/একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায় । আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যতীশদার ভক্ত-চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর । চির-অভ্রান্ত মঙ্গলময় যিনি তাঁর শ্রীমুখ থেকে এমন একজন ভক্তের প্রভুপ্রেম বা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠার কথা জেনে আমরা যেন নিজেদের ভক্তিজগতের অবস্থান নিয়ে ভাবতে বসি । এই ভক্ত-চরিত্র যুগ-যুগ ধরে অনুসারীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে প্রেরণা জোগাবে । সেই নিরিখে নিজেকে ফেলে সকল দোষ–দুর্বলতা নিয়েই সবিনয়ে আবেগভরে উচ্চারণ করি, প্রভু! আমি তোমাকে ভালবাসি ।

প্রেমল ঠাকুর

শ্রীপ্রলয় মজুমদার

স্মৃতি বীক্ষণ

বর্তমান বাংলা কথাশিল্পে এক প্রবাদপ্রতিম অনন্য ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়দাকে আমি খুব কাছে থেকে একই মঞ্চে বসে পাশাপাশি প্রথম দেখি এবং তাঁর কথা শুনি। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ সংগঠনের গিধনি আশ্রমের উৎসবের সান্ধ্যকালীন সাধারণ সভায়। ইতিপূর্বে তাঁর লেখা অন্যান্য বই-এর সাথে আমি 'কাছের ঠাকুর' বইখানিও পড়েছি। আমরা দুজনেই দেওঘর সৎসঙ্গ থেকে সমসাময়িক কালে, কমবেশি আগে পরে গিধনি আশ্রমের 'শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ' সংগঠনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেই। সাক্ষাতে আন্তরিক আলাপচারিতার বাস্তব পরিচিতি সে সময়ে আমাদের দুজনের ছিল না।

গিধনিতে সাধারণ সভাতে তাঁর আলোচনা শোনার পরে আমাকে একজন সতীর্থ সহকর্মী বলেছিলেন–আপনার সাথে শীর্ষেন্দুদার আলাপ আছে?

আমি বললাম–ব্যক্তিগতভাবে তেমন পরিচিতি বা আলাপচারিতা নেই।

তিনি বললেন–চলুন, আপনার সাথে আলাপ করিয়ে দিই।

আমি বললাম–না, তার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে–কেন?

আমি বললাম–ওভাবে কোন দিনও আলাপ হয় না। সত্তার আকুল চাহিদার স্পন্দন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। সে প্রতিধ্বনিই সময়ে আলাপ করিয়ে দেবে। সময়ে সবই হবে। তার জন্যে ব্যস্ততার কোন রকম প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।

আপনি ওনার "কাছের ঠাকুর" পড়েছেন?

হ্যাঁ পড়েছি।

কেমন মনে হয়েছে আপনার?

অনুভবের বিবর্তনের এক অকপট নিরপেক্ষ বর্ণনা। বিবর্তন সব সময়েই বিবর্দ্ধনমুখী। সেই যে বিবর্দ্ধন, –তার অগ্নিমুখ আচার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই বন্ধুর চড়াই উৎরাই-এর পথ পার হতে তো অনুভবের বিবর্তনই বিবর্দ্ধনের প্রতিধ্বনির অন্বেষণ করে।

বাংলা সাহিত্যের সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ব্যক্তিগতভাবে আমার বরেণ্য নমস্য প্রণম্য অগ্রজ অগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়দার সাথে আমার দ্বিতীয়বার যোগাযোগ হলো। হাওড়ার সর্বক্ষণের সম্মানীয় নিয়ত কর্মী শ্রদ্ধেয় জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দার বাড়ীর কাছে বীণাপাণি ক্লাব মঞ্চে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব উপলক্ষ্যেই।

কলকাতা থেকেই দুজনে এক সাথেই গাড়ীতে রওনা হলাম। বিদ্যাসাগর সেতু পার হবার সময়েই শ্রদ্ধেয় শীর্ষেন্দুদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, –সুজিতের কী খবর প্রলয়?

আমি খুব অবাক হলাম। বিস্মিত হয়ে গেলাম। তাঁর অমন আন্তরিক পারিবারিক টানের মতোই সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহারেই। তিনি যে আমাকে চেনেন, জানেন এবং আমার সমস্ত রকম পারিবারিক বিষয়ের ঘটনা প্রবাহের সংবাদের সাথেই পরিচিত, সে সব শুনে ও জেনেই মনে হলো–আমার সেদিনের প্রথম দর্শনের অনুভবের মধ্যে কোন প্রাচীর ছিল না।

শীর্ষেন্দুদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন–সুজিত এখন কোথায়? কি করছে কী?

আমি বললাম–উনি আমার কাকা।

শীর্ষেন্দুদা বললেন– জানি। আমরা প্রায় সমসাময়িক। অনেকদিন কোন খবর পাই না।

তারপর আমার কাকার বিষয়েই কিছুক্ষণ কথা হলো।

সেই থেকে অনেকবার অনেক জায়গায় আমরা দুজনেই একসঙ্গে বহু উৎসবে অংশগ্রহণ করেছি। বাংলাদেশেও দুজনে এক সাথে বেশ কিছুদিন হিমাইতপুরে এবং অন্যান্য জায়গাতেও বহু উৎসবে গেছি। ব্যক্তিগত আলাপচারিতাই আজ যেন শ্রদ্ধার্হ সম্মানজনক এক নিবিড়তম আন্তরিক আত্মীয়তাতেই পর্য্যবসিত। শীর্ষেন্দুদা তাঁর বিশেষ স্নেহ আর ভালোবাসার চাদরে আমাকে আবৃত করে বইমেলাতে প্রকাশিত তাঁর একখানি বই আমাকে উৎসর্গ করেছেন।

সময়ের সঙ্গে এমন নিবিড় নৈকট্যের সম্পর্কে শীর্ষেন্দুদা আমাকে অনেক রকম প্রসঙ্গের আলোচনার সূত্রে বললেন– প্রলয়, আপনি একটা কাজ করুন।

জিজ্ঞাসা করলাম– কী কাজ দাদা?

তিনি বললেন–দেখুন, আপনি ভালো বক্তৃতা করেন। ঠিক আছে। কিন্তু জানবেন যে, বক্তৃতা মানুষ মনে রাখে না। বক্তৃতা কোন স্থায়ী কাজ নয়। ঠাকুরকে নিয়ে আপনি একটা স্থায়ী কাজ করুন। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক সম্মানের শীর্ষে বসে থাকা কিংবদন্তী এমন মানুষের আদেশেই আমার ভিতরের ভুবনে আলোড়ন হলো। উথালপাতাল হয়ে সেই সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম– আমার দ্বারা কী ধরণের স্থায়ী কাজ হতে পারে দাদা?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নস্যি নিলেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। চশমার ভিতর দিয়েই তাঁর দৃষ্টি জনপদ প্রকৃতি প্রান্তরকে অতিক্রম করে দ্রুত ছুটতে লাগলো।

ভিতরের স্পন্দন দিয়েই যেন স্পন্দনের বিগ্রহের শরীরকে স্পর্শ করতে চাইছেন। যে অনুভবী বীক্ষণা তাঁকে চলমান সমাজ জীবন থেকে সাহিত্যের সম্ভারের যোগান দেয়, সেই অনুভবের শরীরের সাগরে ডুবলেন। ডুব দিলেন। এ এক অন্য মানুষ। সাংসারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের শীর্ষে থাকা আসন থেকে যেন নেমে আসা তপস্যা সাধনা প্রার্থনার আঙ্গিনায় পথচলা এক সত্তা। চারিদিক থেকে তাঁর সত্তার স্পন্দনের আকুল চাহিদার প্রার্থনার অন্বেষণের সেই বিগ্রহের শরীরকে স্পর্শ করবার এক অন্তহীন হিমালয়ান্তিক অন্তর্লীন ব্যঞ্জনায়, তাঁর জীবনে, তাঁর প্রিয়পরমের সামগ্রিক রূপ রস গন্ধ বর্ণের স্পর্শের মাধুর্য্যের পর্য্যবেক্ষণে নিরীক্ষণে আহরণে অর্জনের এক পাগলকরা আর্তিভরা আকুলতায় বললেন– প্রলয়, আপনি ভাগ্যবান। জন্ম থেকেই ঠাকুরকে পেয়েছেন। ঠাকুরের কাছে থেকেছেন। দেখেছেনও। আমি তো মাত্র চার সাড়ে চার বছর ঠাকুরকে দেখেছি। সেদিনের মানসিক টানাপোড়েনের সাথেই অভাব অনটনের মধ্যেও বারে বারে ছুটে ছুটে ঠাকুরের কাছে চলে যাওয়া। ঠাকুরের কাছে গিয়ে শুধু তাঁকে প্রাণভরে দেখেছি প্রলয়। আমার কোন জিজ্ঞাসা ছিল না। ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়েই যেন আমার মনে হয়েছে– এই চোখ সব জানে। সব দেখে। আমার সত্তার সমস্ত কিছুর নির্বাণ এখানে। তিনি আমার দিকে শেষের দিকে একবার অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিলেন প্রলয়। সে দৃষ্টি যেন অবর্ণনীয়! আমার মনে হচ্ছিল, মোম যেমন করে গলে যায়, আমি যেন ভিতর থেকে আমার সমস্ত অবসাদগ্রস্ততা নিয়েই কেমন গলে যাচ্ছি। আর সম্পূর্ণ নতুন এক অপ্রকাশিত অবর্ণনীয় আনন্দ যেন জন্ম নিচ্ছে তাঁর দৃষ্টিতে আমার ভিতরেই। কি এক অভূতপূর্ব অনির্বাচনীয় জ্যোতির্ময়তায় ভরা–সেই চোখ–সেই শরীর–সেই অবয়ব! আমাকে সম্পূর্ণ গলিয়ে যেন মিশিয়ে দিচ্ছিল। আমার কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কারণ, কোন প্রয়োজন ছিল না। ঠাকুরের সেই চোখের দিকেই চেয়ে আমার মনে হয়েছিল– এই চোখই তো আমি সারাজীবন খুঁজেছি, চেয়েছি যা এখন পেয়েছি।

ছুটন্ত গাড়ীতে ভিতরে শুধু আমরা দুজনেই। কখনও সামনে সোজা চেয়ে তিনি কথা বলছিলেন। জানি না ঠিক, আমার সাথে, না নিজের স্মৃতির সাথেই। তারপর আবার বলে উঠলেন তিনি, –জানেন প্রলয়, ডুবন্ত মানুষ যেমন কোনকিছু ধরে উঠতে চায় শুধু বাঁচার জন্য, ঠিক আমিও তেমনি অসহায়ের মতোই ঠাকুরকেই আঁকড়ে ধরেছি বাঁচার জন্যই। তাই তো সে সময়ে নাম করেছি। খুব নাম করি। নাম করে নামের শক্তির প্রয়োগে পরীক্ষা করে অনুভব করি নামের ভিতরেও তিনি কেমন জীবন্ত হয়ে আছেন। তখন বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। নির্ভরতা আসে। ঠাকুর আরও নিবিড়তম হয়ে কেমন যেন ধরা দেয়। এক এক সময় হঠাৎ করে খুব নাম হতে থাকে। আবার কোন কোনও সময় কেমন ফাঁকা ভাব। তখন বুঝি নামের প্রয়োজনটা হয়তো তখন সঠিক ছিল বলেই হল। নানা রকমারি অনুভবের অভিব্যক্তিতে তন্ময় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে নাকের ভিতরে অভ্যাসবশতঃ নস্যি টেনে নিচ্ছেন। ছুটন্ত গাড়ীর ভিতরে থেকেও যেন কেমন স্মৃতিতে ছুটন্ত তিনি। জানেন প্রলয়, আমার তো মনে হয় ঠাকুর যে বসে থাকতেন, ঐ একই সময়েই যেন তিনি কেমন দুরন্ত গতিতে লক্ষ লক্ষ যুগকে অতিক্রম করে গেছেন। আমরা তা ধরতে পারিনি। বুঝতেই পারিনি, তা ধরবো কেমন করে! সেই জন্যই তো আমার মনে হয় যে, ঠাকুরের কাছে থাকা-দেখা মানুষেরা যেন অবিকৃতভাবেই সে সব বর্ণনা রেখে যান। আমি তো আজও সেই সব পুরানোযুগের মানুষের কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনি। আমার মনে হয়, বহু ভক্তের বহু রকমের দেখা সব মুহূর্ত্তের ভিতরেই ঠাকুরের ধরা পড়া ছবি আর বর্ণনাও যেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ এক জীবনীরই অংশ বিশেষ। বহু পার্ষদ ভক্তের স্মৃতিতে ধরে রাখা ঠাকুরের খণ্ড মুহূর্ত্তে চিত্রও যেন ঠাকুরের অখণ্ড অবয়বকে প্রকাশ করে।

ঠাকুরের ভুবনে শীর্ষেন্দু যেন এক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কর্মে ব্যস্ত। অসহায়ের মতোই তিনি সেই সব মানুষের স্মৃতির ভুবনকে খুঁড়ছেন। বার করে আনছেন ঠাকুরের ধরে রাখা স্মৃতিচিহ্ন মুহূর্ত্তকে।

প্রলয়–

বলুন–

আপনি অনেকদিন ঠাকুরকে পেয়েছেন আপনার জীবনে। বিভিন্ন উৎসবের সাধারণ সভায় আপনি আপনার স্মৃতিচয়ণ করেন। ঠাকুরের অনেক মুহূর্ত্ত উঠে আসে আপনার বক্তৃতায়। জানবেন যে, –বক্তৃতা কিন্তু মানুষ মনে রাখে না। অনেক ভক্ত পার্ষদ মানুষ অনেক মুহূর্ত্তকে ধরে রাখেননি। তাঁরা চলে গেছেন। তার সাথে সাথেই সে সব মুহূর্ত্তের স্মৃতিও কিন্তু চলে গেছে। যদি সে সব তাঁরা লিখে যেতেন, তাহলে আমাদের এবং ভবিষ্যকালের মানুষের সুবিধা হতো।

ঠিক বলেছেন।

সেই জন্যই তো আপনাকে বলছি। আপনার স্মৃতিতে যা দেখা ধরা আছে সে সব কিছুই আপনি লিখে যান। এটা কিন্তু একটা স্থায়ী কাজ। মানুষ চলে গেলেও লেখাটা থেকে যাবে। ভবিষ্যকালের মানুষ পাবে সেই লেখাতেই ঠাকুরের স্পর্শ রূপ গন্ধ বর্ণকে।

ঠিক বলেছেন দাদা।

প্রলয়, ঠাকুরের আদর্শগত মত পথ তত্ত্বগত বিশ্লেষণ ভবিষ্যকালের কাজের মানুষেরা করবেন। তাই আমাদের তত্ত্বগত বিশ্লেষণের লেখার প্রয়োজনের চেয়ে, ঠাকুরের জীবনের মুহূর্ত্তকে যেমন যাঁর দেখা সে সব লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার দরকারই বেশী। তাতে ভবিষ্যতের কাজের মানুষেরা কাজ করতে গিয়ে তার থেকেই প্রয়োজনীয় অনেক রসদ আহরণ করে নিতে পারবেন। তাই আমি পুরোন

মানুষদের সবাইকে তো বলেছি। আজ আপনাকেও বলছি আমি, আপনি সেই স্থায়ী কাজটা করে যান প্রলয়। বক্তৃতার সাথে সাথে এই স্থায়ী কাজটাও আপনি করুন।

অন্ধকার ভরা নিস্তব্ধ গভীর রাতে কোলকাতার যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটের রাস্তার সামনে গাড়ী এসে থামলো। সাদা ধুতি আর হাফ হাতা ঋত্বিকের পোষাকেই স্যুটকেশ নিয়ে তিনি নেমে গেলেন। গাড়ীর বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে দরজাটাকে ঠেলে দিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদনে প্রণাম জানিয়ে গাড়ী ছুটলো বাগুইআটীতে আমার বাড়ীর দিকে।

অন্ধকার নিশুতি রাতের নিস্তব্ধ কোলকাতার বুকে সামান্য শব্দের সাথেই গাড়ীর ভিতরে এতক্ষণের আলোচনার শব্দগুলো কেমন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে লাগলো। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার এক নিবিড়তম নৈকট্যের ভুবনে নিমজ্জিত হয়ে ভাবতে শুরু করলাম আমি। স্মৃতির ভুবনে একটা ধাক্কা কেমন আলোড়িত করলো আমায়। ছেঁড়া ছেঁড়া খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলো কেমন উড়ন্ত মেঘের মতো ঘন হয়ে জমাট বাঁধতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে একটা অখণ্ড রূপ নিতে নিতেই কেমন অবয়ব হয়ে গেল।

সে সময়ে আমরা থাকি পুরন্দহে। শ্রদ্ধেয় প্রয়াত রমেশ চক্রবর্ত্তীদার বাড়ীতে। আমার কাকা, ঠাকুরের নির্দেশেই ঠাকুর বাংলোর ভিতরে থাকেন। শ্রদ্ধেয় প্রয়াত প্যারী নন্দীদার পাশের ঘরে। ছোট্ট একটা মাত্র ঘর ছিল কাকার।

আশ্রমে ঠাকুরের কাছে দু'বেলাই দেখা হয় কাকার সঙ্গে। আমার কাকার সেই সুন্দর ফর্সা লাল টুকটুকে মুখখানা কেমন জঙ্গলের মতো দাড়ি গোঁফে ভর্ত্তি। ধবধবে টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ কেমন রোদ জ্বলা ধূলো আর নোংরার পলেস্তারাতে তামাটে বর্ণের হয়ে গেছে। কাকার জামাকাপড় আর সমস্ত চেহারাতেই যেন একটা নোংরার মানচিত্র আঁকা।

ঠাকুরের সামানে দু'বেলাতেই এমন চেহারাতেই কাকার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কাকা দিব্যি ঠাকুরের সামনে সকলের সাথেই বসছেন। কথাবার্ত্তা বলছেন। আলোচনা করছেন। শুনছেন। ঠাকুর আমার কাকাকে দেখছেন। তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেনও। কখনও বা কোন সময়ে খুব সুন্দর মিষ্টি হাসিতেও হাসছেন ঠাকুর। ঠাকুরের সেই হাসির সময়েই আমার কাকা কেমন যেন একটা ইচ্ছে অনিচ্ছের দোলায় জোর করেই একরকম হাসতেন, সেটা খুব ভাল করেই কিন্তু বোঝা যেত। সে হাসিটা কাকার ভিতর থেকে উঠে আসা হাসি নয়।

ঠাকুর কিন্তু আমার কাকার সেই জোর করে টেনে আনা হাসির সাথেই মেলানো হাসিতেই দু'চোখের একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গিমাতেই কেমন সুন্দর ভুরু নাচাতেন। ইশারা করতেন। কোন কোন সময়ে একটা চোখ টিপে কেমন অসাধারণ অঙ্গভঙ্গি করে শরীর দোলাতেন এক অভূতপূর্ব সুন্দর হাসিতেই। মনে হতো, কোন কিছু ব্যাপার বিষয়ে যেন উৎসাহ দিচ্ছেন। সংকেতেই সুন্দর কথা হতো দু'জনেরই।

আমার বাবার ষষ্ঠ সহোদর শ্রীসুজিতকান্ত মজুমদার।

একেবারে আপোদমস্তক শৌখিন। দাম্ভিক, সাংগীতিক আর অত্যন্ত পড়ুয়ামানের সেই মানুষটিই যেন কেমন হঠাৎ করে রাতারাতি বদলে গেল একেবারে।

আমাদের বাগুইআটির বাড়ীতে গেট খুলে ঢুকতেই বাঁ দিকের ঘরটাকে তো আজও আমরা 'রাঙাকাকার' ঘর বলি। ঐ ঘরেই থাকতেন কাকা। তাঁর পড়াশুনো, গানবাজনা, আড্ডা, সবই ছিল সেই ঘরেই। বি.এস.সি. পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাকা পণ্ডিত তারাপদ চক্রবর্ত্তী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সংগীতের তালিম নিতেন। তার সাথে সে সময়ে আবার রেডিও বানানোর কাজও শিখতেন।

আমাদের বাগুইআটির এই বাড়ীটাকে দেখলে আজকে কল্পনাও করা যাবে না যে, এই বাড়ীতেই সেদিন আমরা অতগুলো মানুষ থাকতাম কেমন করে। গানে বাজনায় নাচে নাটকের মহলায় জমজমাট আড্ডা আর সব কিছুর সাথেই আমার বাবার প্রাণবন্ত ঠাকুরের যাজন যেন সব সময়েই কেমন জমিয়ে রাখতো বাড়ীটাকে।

বি.এস.সি. পাশ করার পরেই কাকা একদিন চলে গেলেন চাকরি পেয়ে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে শিক্ষকতার চাকরি। সেখানেই থাকতেন। মাঝে মধ্যে কাকা বাড়ী আসতেন। সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কাকা এলেন।

কেমন গম্ভীর চিন্তিত ভারী থমথমে মুখ। কারোও সঙ্গেই তেমন বিশেষ কোন কথা বললেন না। সকালে বাবার ঘরে যেমন জমাট যাজনের আড্ডা বসে, তেমনি একে একে বেশ ভিড় জমে গেল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সাথে বাবার প্রাণময় জীবন্ত যাজন। ঠাকুর যেন যাজনে আবাহনে শরীরী আসনে কেমন স্পন্দনে কম্পনে অনুভবে। সে এক ভরাট জমাট মৌজের মহল। হঠাৎ করে বাবার ঘরে চৌকির সামনে এসে কাকা দাঁড়ালেন। আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন কাকা, –আচ্ছা বড়দা তোর ঠাকুর কি ভগবান?

তা আমি কি করে কব। তুই নিজেই য্যায়ে দেখে আয় গা।

তোর ঠাকুর কি ভগবান দেখাতে পারেন?

তুই নিজেই য্যায়ে ঠাকুরেক্ জিজ্ঞাসা করে আয় গা।

আমাকে কি ঠাকুর চিনতে পারবেন? আর আমি ওখানে থাকবোই বা কোথায়?

সে না হয় আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুই যাবি কবে?

আজই। রাত্রের ট্রেনেই যাব।

সকালে সকলের সাথে প্রণাম করে মাথা তুলতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাত তুলে বললেন, –এ্যাই, তুই গব্রার ভাই না?

গান

আয় ছুটে আয়

বিজয়কৃষ্ণ ভৌমিক(স.প্র.ঋ.)

আয় ছুটে আয়, আয়রে তোরা
প্রাণের ঠাকুর ডাকছে আয়।
মনের কথা বলবো সবে
গলাগলি করবো আয়।

ঝেড়ে ফেলে দলাদলি
ছলচাতুরী বলাবলি।
রাধাস্বামী রাধা নামের
সুর তুলিব ছুটে আয়।

লক্ষ্মীরা সব দলে দলে
বসে আছে শিশু কোলে।
ভক্তরা সব ঠাকুর ঘরে
আপন মনে গুণগুণায়।

দিন যে গেল সন্ধ্যা হল
সন্ধ্যারতির সময় হলো।
দীপের আলোয় ধূপের ধোয়ায়
তাণ্ডব নৃত্তে কীর্তন গাই।

নারায়ণের হাতের জল
কেমনে তোরা ফেলবি বল।
অন্নপূর্ণার রাঁধা অন্ন
প্রসাদ খেয়ে প্রাণ জুড়াই।

বিশ্বপিতার বিশ্বপিতার বিশ্বটাকে
ভরিয়ে দিব সত্য বাক্যে।
রাধাস্বামী ইষ্ট নাম
ছড়িয়ে দিব দুনিয়ায়।

ভজন

ডা. ভুপেন্দ্রনাথ মণ্ডল

১
জীবন আমার ধন্য হলো–
ঠাকুর তোমায় পেয়ে
মন প্রাণ দিয়ে গেয়ে যাব
তোমারি গান গেয়ে।
পরম দয়াল হয়ে মোদের
সামনে আছেন যিনি,
আপদ বিপদ থাকবে নাগো
পারের কর্তা তিনি।
মনে-প্রাণে জপ এ নাম
তাঁকে সপিয়ে
বিপদ পথের তুমি হরি
দিবা নিশি তোমায় স্মরি।
এবার হরি হরি বলি
তোমারি পথ চেয়ে
জীবন আমার ধন্য হলো
ঠাকুর তোমায় পেয়ে।

২
জীবন তরীর মাঝে তুমি
আমি ভুলব না তোমায়
মৃত্যুর সময় হলে দয়াল
রেখ তোমার পায়।

ষড় রিপুর মাঝে থেকে
করেছি কত ভুল
ভুলের ক্ষমা করে দয়াল
দিয় তুমি কুল
আমার বলতে যা-কিছু সব
দিলাম গো তোমায়।

বলদ যেমন ঘানি পড়ে
ঘুরছে দিবা-নিশি
আমি তেমন সংসার জালে
করছি মেশামিশি
এবার মনের ভ্রম কেটে আমি
উঠব তোমার ন্যায়।

SRI SRI THAKUR ANUKULCHANDRA

Founder SATSANG, PABNA
Krishna Prosanna Bhattachariya

THE EXPENSES INCURRED ON THE AFORESAID ITEMS

1. Average annual medical aid administered to the ill and diseased amongst the refugees, Satsangees and non-Satsangees and amongst the poor people of the locality about Rupees 9,0007- totalling in this whole period as per record.....Rs. 53,0007-

2. Average monthly expenditure for food and other accessories thereof to the refugees including Satsangees and Non-Satsangees and aids therefor to the temporary refugees staying at Satsang Rs. 11,7507- as per record totalling in the six years to the huge amount of Rs. 8,40,3707-

3. The monthly expenditure for the houses rented for the refugees, Satsangees and Non Satsangees-Rs, 1,9347- totalling in six years as per record Rs. 1,39,2887-.

4. The monthly expenditure for the occasional visitors, refugees and non-refugees, periodical visitors and guests during the Conferences and als,o for the poor who daily come to Satsang Charity Kitchen (Sadabrara) for their daily food, morning and evening (excluding the expenses for permanent refugee family

shown in the item No.2) Rs. 2,0147- total amounting in these six years as per record-Rs. 1,35,0317-.

5. The average annual occasional help in the shape of money, clothes, beddings, utensils etc. (other than in the items shown above) for the local and outside distressed people Rs. 13,0667- total amounting during these six years as per record-Rs. 78,3997-.

6. Cost of purchase of Jeeps (five) cars and one Station wagon for the dissemination of healthy social and cultural ideals of Satsang-Rs. 72,6757- (excluding the expenses for fuels, repairs, working and maintenances)

7. Occasional expenses for the refugees to start their lives anew with Capital and other necessaries to launch upon different industries e.g. Riksaw business, Pan Biri shops, Tailoring and cloth shops, vegetable shops, sweetmeat shops, groceries etc.-Rs. 23,5607-.

8. Total expenses for the marriages of 29 aged girls of the home-less refugees during these six years-Rs. 9,5007-.

9. Total expenditure for the rescue and maintenance of Hindu girls and widows from Pakistan-Rs. 21,0007-.

10. Expenditure for Tapovan Bidyalaya-the Educational Home at Deoghar (including the salaries of teachers and other establishments etc. deducting the amount realised from the tuition fees of the boys)-Rs, 9007- per month, amounting for the last two years to Rs. 21,0007-.

11. Total amount given as donations to other Philanthropic Institutions of Bihar-Rs. 11,4757-.

12. Expenditure for the publications of Sree Sree Thakur's utterances in Bengali,

English, Hindi, Urdu and Assamese from Satsang Publishing House, started newly at Deoghar, to disseminate the healthy ideals of reformation and reconstruction during these six years-Rs. 26,0007-.

13. Total expenditure for the starting anew and maintenance of the Satsang Press at Deoghar for the last years-Rs. 29,0007-.

14. Total expenditure for the starting and maintenance of five journals (Monthly and Quarterly) in English, Hindi, Assamese and Bengali (deducting the amount received form the sale proceeds)-Rs. 17,0007-.

15. Expenditure for starting a new library and Free Reading Room at Ranganvilla, Deoghar, with new books and furniture-Rs. 9,OOOA.

16. Expenses for the starting and maintenance of a small mechancial Workshop for repairs of machineries with technicians and Engineers-Rs. 17,0007-.

17. Expenses for starting and maintaining a carpentry work at Boral Bunglow, Deoghar-Rs. 8,000/-.

18. Expenses for starting anew and maintenance of Satsang Chemical Works at Rangan Villa, Deoghar-Rs. 10,0007-.

19. Expenditure for buying lands and creating a building to create a Branch at Mazafferpur-Rs. 15,0007-.

20. Expenditure for creating a Branch at Benares (two-storied Building)-Rs. 26,0007-.

21. Expenditure to create a centre with its maintenance in U.P.-Rs. 5,0007-.

22. Expenditure for starting and maintenance of the main Branch of West Bengal at Calcutta-at 40, Badridas Temple Street-a house rented at Rs. 4007- every month-total expenses for the last six years including electric and Telephone expenses-Rs. 44,0007-.

সুখবর! **সুখবর!!** **সুখবর!!!**

আপনি কি নতুন লেখক? আপনার লেখা- গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল লেখাগুলি প্রকাশ করতে আগ্রহী? তাহলে নিম্ন ঠিকানায় আজই যোগাযোগ করুন। আমরা শর্ত সাপেক্ষে আপনার লেখা ছাপার উপযোগী হলে অবশ্যই ছাপাবো।

এছাড়া নভেল, নাটক, অনুবাদগ্রন্থ, সিরিজ গ্রন্থ, সাধারণ জ্ঞানের বই, কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল ধরণের বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

নিউজ কর্ণার পাবলিশিং
সিদ্দিকীয়া মিনি মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড
চাঁদনী বাজার, বগুড়া।

সৎসঙ্গের নিজস্ব ওয়েব সাইট ভিজিট করুন
www.srisrithakuranukulchandrasatsang.com

মানসতীর্থ পরিক্রমা

সুশীলচন্দ্র বসু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

দেশবন্ধুর বাড়ীতে অবস্থানকালে তিনি একদিন আমাকে বললেন–"দেখুন! বালীগঞ্জ লেকের ধারে ৫০ বিঘা জমি আমার control-এ আছে, সেটা আমি আপনাদের আশ্রমের জন্য দিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলে আপনারা যদি এখানে আশ্রম স্থাপন করেন তাহলে দেশের জনসাধারণ ও বড় বড় লোক আপনাদের কাজকর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পারবেন ও তাদের সাহায্য ও সহানুভূতিও পাবেন প্রচুর; আশ্রমও সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য সফল হবে শ্রীঘ্রই।"

সেবার কলকাতা থেকে আশ্রমে যেয়ে দেশবন্ধুর প্রস্তাবটা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পেশ করলাম ও বললাম– "কলকাতায় যদি আমাদের এই আশ্রম স্থাপন করা যায় তবে আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ লোকের সামনে তুলে ধরবার খুব সুবিধা হবে।"

আমি আশা করেছিলাম যে শ্রীশ্রীঠাকুর এ প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন। সব শুনে তিনি বললেন– "দাশদা ও আপনি যা অনুমান করেছেন তা ঠিকই, আপনাদের আশ্রম ওখানে হলে তা শীগগির বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানেন? একটা অজ পাড়াগাঁ, যেখানে কোন কিছুরই সুবিধা নেই বরং পদে-পদে বাধাবিঘ্ন অনেক, এরকম একটা জায়গা থেকে যদি আপনারা আপনাদের আশ্রম গড়ে তুলতে পারেন তাহ'লে ভবিষ্যতে আর কোন বাধাবিঘ্নই আপনাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাই কলকাতায় সুবিধার চাইতে এখানে হিমাইতপুরে থেকে আশ্রমের কাজ চালিয়ে যাওয়া পছন্দ করি।"

আমি বললাম–"উপস্থিত আমরা যদি কলকাতায় আশ্রম স্থাপন নাও করি তথাপি দেশবন্ধু যখন ৫০ বিঘা জমি দিতে চাইছেন সে জমিটা এখন নিয়ে রেখে দিলে ক্ষতি কি? ভবিষ্যতে সেই জমিটা বিক্রী করে দিলেও কোটি টাকা পেতে পারা যাবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর–"সেখানে আশ্রম স্থাপনের যখন কোন সংকল্পই আপাতত নেই, তখন জমি নেব কেন?"

এমন নিস্পৃহতা বা লোভশূন্যতা মানুষে সম্ভব কি করে তা জানি না।

সেবার আশ্রম থেকে ফিরে গিয়ে পুনরায় দেশবন্ধুর বাড়ীতে এসে উঠলাম। একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম–"আপনি প্রথম দর্শনেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে আপনার গুরুরূপে বরণ করলেন কি করে? আপনার দেশজোড়া নাম আর বাংলাদেশের লোকের কাছেও শ্রীশ্রীঠাকুর একরূপ অপরিচিত। একটা ভাবাবেগের প্রাবল্যে বিচলিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করেননি তো! যদি তাই করে থাকেন তাহলে ভাবের প্রাবল্যে ভাঁটা পড়লে আপনার গুরুনিষ্ঠা কি চলে যাবে না?"

দেশবন্ধু–"না তা নয়। আমি ভাবের ঘোরে তাঁকে গ্রহণ করিনি। আমি যখন ডুম্‌রাওনে case করি তখন বারীনের (শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনি।

তখনই তাঁর সাথে দেখা করার প্রবল আগ্রহ হয়। নানাকাজে জড়িত থাকার জন্য সে সময় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কলকাতায় তিনি আছেন এ কথা আপনাদের কাছ থেকে শুনে যখন মানিকতলা বাড়ীতে তাঁকে দেখতে যাই তখন প্রথম দর্শনেই যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল তা হচ্ছে তাঁর wonderful childlike simplicity (আশ্চর্য্য বালকসুলভ সরলতা), তাই দেখে আমি ভাবলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স (৩৬) হয়েছে, অথচ কি শিশুর মত সারল্য তাঁর! এ তো একটা সহজ কথা নয়। পূর্ণজ্ঞান না হলে এরূপ সারল্য সম্ভব নয়। তারপর আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন I was beset with innumerable difficulties which, inspite of the knowledge and experience I had, I could not solve. (আমি এত অসংখ্য বাধাবিঘ্নতে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে তার সমাধান করতে পারি নাই)। আমার জীবনের সেই সব অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নের কথা যখন তাঁর কাছ বললাম তখন তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করে সামান্য কটা কথায় আমার সব

সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তখন আমি জানলাম-ইনি কেবল শিশুর মত সরলই নন অসাধারণ জ্ঞানীও বটে। তাই তখন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর রইল না।"

একটা কথা এখানে বলতে ভুলে গিয়েছি। দেশবন্ধু দীক্ষা গ্রহণের পর বোম্বে চলে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে নিজের পুত্র চিররঞ্জন ও পুত্রবধু সুজাতা দেবীকে সৎমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে শ্রীমান সুধীরচন্দ্র মুখার্জ্জির সাথে তাঁদের আশ্রমে পাঠিয়ে দেন তাঁরা সুদীর্ঘ দিন আশ্রমে ছিলেন।

দেশবন্ধু দীক্ষাগ্রহণের পর যেখানেই যেতেন সেখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সবার কাছে বলতেন। সেটার পরিচয় আমি পাই পরে বোম্বে গিয়ে ড. জয়াকরের সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়। দেশবন্ধুর সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ হওয়ায় তাঁর মনে এই ধারণাই জন্মায় যে রাজনীতির ঘুর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা ক্ষুণ্ন হয়েছিল, ধর্ম্মজীবন অনুসরণ করলে তিনি দেশের জন্য আরও বড় দান রেখে যেতে পারতেন পরে এই কথা তাঁর আত্মজীবনী,–"The Story of my life" এ লিখে গেছেন,–

Altogether, I always felt that Das, in another age, with greater freedom to achieve his ideals, unmeshed in the maelstorm of party-politics, would have been the centre of a great movement not unlike what a couple of his predecessors had creadted in Bengal. His fearlessness and sacrifice would then have met with a far longer and more generous response than be received during his life time.

ড. জয়াকর ছিলেন ব্যারিষ্টার এবং বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor. তিনি আমায় একথা বললেন– "শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমি দেখিনি। দেশবন্ধুর কাছ থেকে তাঁর কথা শুনে তাঁকে আমার দেখবার ইচ্ছা হয়েছে জানি না সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা।"

মথুরায় গিয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একজন বিশেষ সদস্যের সাথে পরিচয় হয়। তাঁর নামটা আমার মনে নেই। তিনিও আমাকে বলেছিলেন যে তিনিও দেশবন্ধুর কাছ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন।

... যতদিন দেশবন্ধুর বাড়ীতে কাটিয়েছি, কোনদিন তাঁকে কোন কিছুতে উত্তেজিত হয়ে উঠতে বড় একটা দেখিনি। সকলের সঙ্গেই বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে তাঁকে আলোচনা করতে দেখেছি। এর ব্যতিক্রম দেখলাম একদিন সকাল বেলা। তখন তিনি তাঁর বাইরের ঘরে গিয়ে বসেছেন। সাধারণতঃ সকালবেলা বাইরের ঘরে গিয়ে বসবার সময় আমিও তাঁর সঙ্গে গিয়ে বসতাম ও গল্প-সল্প করতাম। সেদিন আমার যেতে একটু দেরী হয়েছিল। এর মধ্যে দেশবন্ধুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁর স্বরাজ্যদলের শৈলেশ বিশী, সত্যেন মিত্র, হেমেন দাশগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। আমি গিয়ে শুনলাম যে দেশবন্ধু বললেন–"যে বলতে পারে, I pawned my wife for a vote in the Council, তিনি যদি আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চান তবে আমি তা করতে রাজি আছি। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে যেয়ে তাঁকে খোসামোদ করে নিয়ে আসব-অতবড় মহাত্মা আমি এখনো হইনি!"

পরে বুঝলাম যে বিপিন পাল সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। স্বরাজ্য দলের কয়েকজন সভ্য দেশবন্ধুকে অনুরোধ জানতে এসেছিলেন যে তিনি যদি নিজে শ্রীযুক্ত বিপিন পালের বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন তাহলে তিনি স্বরাজ্যদলে যোগ দিতে পারেন। তাঁদের সেই অনুরোধে উত্তেজিত হয়ে দেশবন্ধু ঐ উক্তি করেছিলেন।

বিপিন পাল মহাশয় যখন একবার খুব আর্থিক সঙ্কটে পরেছিলেন তখন দেশবন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন ও তাঁর আর্থিক সঙ্কট দূর করেছিলেন।

আর একবার দেশবন্ধুকে উত্তেজিত হ'তে দেখেছিলাম সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের সময়। দেশবন্ধু সংকল্প করেছিলেন যে তিনি গোপীনাথ সাহাকে (যিনি পুলিশ কমিশনার টেগার্টভ্রমে একজন নিরীহ ইংরেজকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন এবং বিচারে যাঁর-ফাঁসি হ'ল) শহীদ বলে ঘোষণা করে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবেন। সম্মেলনের পূর্ব্বে বিষয়-নির্ব্বাচনী থাকতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে এ বিষয়ে তাঁরা দেশবন্ধুর

বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন ।

তখন দেশবন্ধু খুব উত্তেজিত হয় দৃপ্তকণ্ঠে বললেন–"আমি চিত্তরঞ্জন দাস, আপনাদের কাছে বলছি যে আজকের প্রকাশ্য সম্মেলনের অধিবেশনে আমি গোপীনাথ সাহার সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ করে নেবই, আপনাদের ক্ষমতা থাকে আমাকে রুখবেন ।"

সেদিন প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর আবেগময়ী বক্তৃতার জোরে সকলে তাঁর মতে সায় দিলেন এবং প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল ।

দেশবন্ধু যে কিরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ আমি যখন কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতাম তখন পেয়েছি । একদিন এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ (বাঁকুড়াবাসী) তাঁর কন্যার বিবাহের সাহায্যের জন্য আমাদের হোস্টেলে এলেন । বাঁকুড়া জেলার একটি ছেলে হোস্টেলে থাকত । সেই ছেলেটি ঐ বৃদ্ধের স্বগ্রামবাসী । সে-ই বললে–বৃদ্ধ দরিদ্র কিন্তু সৎলোক । তার কথা শুনে আমরা হোস্টেলের সবাই ঠিক করলাম হোস্টেলের সবাই কিছু করে দিয়ে বৃদ্ধকে সাহায্য করব, আর ৫০ টাকা তুলে দিলাম ।

দেওয়ার পরে ভাবলাম– এতে তো' ওঁর কিছুই হ'বে না । সে সময়ে আমি দেশবন্ধুর দানের কথা শুনেছিলাম তাই সেই বৃদ্ধকে ডেকে মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়ীর নাম ও ঠিকানা লিখে দিয়ে বললাম–সকাল আটটার সময় চিত্তরঞ্জন দাশবাবু বাইরের ঘরে বসেন (তখনও তাঁর নাম দেশবন্ধুর হয়নি) । তাঁর সঙ্গে দেখা করে আপনার কন্যাদায়ের কথা জানিয়ে কত টাকা আপনার এ কাজে লাগবে তা তাঁকে নিঃসঙ্কোচে নিবেদন করবেন । তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন । আমি তাঁকে বলে-কয়ে তো পাঠালাম, তখনও জানতাম না যে বৃদ্ধ তাঁর দ্বারা কতখানি উপৃকত হবেন । বৃদ্ধ যেতেই সাহস করছিলেন না । আমি তাঁকে সাহস দিয়ে বললাম– দাশবাবুর কাছ থেকে আপনি কিছুতেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরবেন না, যদি তাঁকে ধরতে পারেন ।

আমার কথানুযায়ী সেই বৃদ্ধ তার পরদিনই সকালে আটটায় গিয়ে দাশ-মহাশয়ের সাথে দেখা করে তাঁর কন্যাদায়ের কথা বললেন । দাশ-মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন–"কত হলে আপনার কন্যাদায় উদ্ধার হতে পারে?" বৃদ্ধ বিনীতভাবে বললেন–"এক হাজার টাকা হলে আমার সমস্ত দায় উদ্ধার হয় ।"

দাশ মহাশয় দ্বিরুক্তি না করে চেক বই বের করে এক হাজার টাকার একটা চেক লিখে সেই ব্রাহ্মণটির হাতে দিলেন । ব্রাহ্মণ তো অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে চেকটা হাতে নিলেন এবং তাঁকে নমস্কার করে চেক নিয়ে চলে এলেন ।

তার পরদিনই ব্রাহ্মণ হোস্টেলে আবার আমার কাছে এলেন এবং বললেন–"যে লোকের কাছে আপনি পাঠিয়েছিলেন এমন লোক এই কলিযুগেও আছে তা আমি পূর্বে ধারণাই করতে পারিনি । আমি তাঁর কাছে আমার কন্যাদায়ের কথা বলা মাত্রই, শুধু প্রশ্ন করলেন কত হ'লে কন্যাদায় উদ্ধার হয়

একটুখানি চোখ রাখুন

ইষ্টপ্রাণ দাদা/মায়েরা, সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার লক্ষ্যে আপনার বার্ষিক বকেয়া গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করুন ।

-সম্পাদক

আর তা শুনেই আমার কথার অণুমাত্র সন্দেহ না করে ১০০০ টাকার একখানা চেক লিখে আমার হাতে দিলেন। আমি যে তাঁকে মিথ্যা ব'লে ঠকাতে পারি এ চিন্তা তাঁর মনে স্থানই পেল না। এ হেন মানুষকে আমার দেবতা বলেই মনে হল। আপনি আমার যে কি উপকার করলেন তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পাচ্ছি না।"

আমি তখন বলাম–"আমি আর কি করলাম! যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছে আপনি চিরকৃতজ্ঞ থাকুন–এই চাই।"

আর একদিন সকালবেলা যখন তিনি ও আমি তাঁর বাড়ীতে বাইরের ঘরে বসেছিলাম তখনও স্বচক্ষে তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছি। একটি ভিখারী এসে বাইরে দরজায় দাঁড়াল। তার পরণে শতছিন্ন জীর্ণবাস। দেশবন্ধুর কাছে একখানা কাপড় ভিক্ষা চাইল। দেশবন্ধু তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন,–"একে আমার একখানা কাপড় দিয়ে দে।"

চাকরটি ভিখারীটিকে ডেকে নিয়ে ভিতর বাড়ীতে গেল। তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে বল্লে–"কাপড় নেই, তুই এই পয়সা নিয়ে চলে যা! কর্ত্তার সামনে আর যাস্‌নে।" সেই ভিখারীটি ঘুরে-ফিরে আবার দেশবন্ধুর সামনে এসে হাজির হল সেই চাকরটির নাম আর এখন মনে নেই। দেশবন্ধু যখন জেলে ছিলেন সেও তখন জেলে কয়েদী ছিল। দেশবন্ধুর সেবায় নিযুক্ত ছিল।

দেশবন্ধু তাকে পুনরায় সামনে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন–"কিরে! কাপড় পাসনি?"

ভিখারী–"না হুজুর!"

দেশবন্ধু চাকরকে হাঁক দিলেন।

চাকরটি আসল।

দেশবন্ধু–"আমার সেই কাপড়খানাই ওকে দিয়ে দে। আমি স্নান করে পরনের এই কাপড়খানাই গায়ে শুকিয়ে নিয়ে পরব।"

কি মহৎ প্রাণের পরিচয়! যে-দেশবন্ধু আইন ব্যবসা করে লক্ষ-লক্ষ টাকা আয় করে অকাতরে খরচ করেছেন ও বিলিয়েছেন, সেই দেশবন্ধু যখন দেশের জন্য দধীচির মত সর্ব্বস্ব দান করে দিলেন তখন তাঁর সুবিধা-অসুবিধা দেখবার জন্য দেশের লোক এগিয়ে এলো না। কি পরিতাপের বিষয়!

তাঁর খরচাদি কি প্রকার ছিল তার দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জনের কাছ থেকে শুনেছিলাম। দেশবন্ধু বিডন উদ্যানে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলেন যে আজ থেকে তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করলেন। সেদিন বাড়ী এসে ডিনার টেবিলে বসে খাবার পর তাঁর বেয়ারা 'শ্যামপেন' মদ নিয়ে এল। পিতাপুত্র একসাথে বসে খাবার পর মদ খেতেন। দেশবন্ধু বললেন–আমি আর মদ খাব না।

চিররঞ্জনও মদ খেল না।

তখন দেশবন্ধু চিররঞ্জনকে বললেন– তোমার মাসিক পকেট খরচা বাবদ আমি তোমাকে ৫০০০ টাকা করে দিতাম। এখন তো ব্যবসা ছেড়ে দিলাম। এখন আর তোমাকে এত দিতে পারব না।

এখন তোমার যৎসামান্য হাত-খরচ, যা নেহাৎ না হ'লে নয় তা তোমাকে আমি দেব।

চিররঞ্জন বললেন–আমাকে আর কিছু দিতে হবে না।

চিররঞ্জনের কাছেই শুনেছি তাঁর বোনদের হাত-খরচের জন্য তিনি প্রতিমাসে তিন চার হাজার টাকা দিতেন। এই রকমই ছিল তাঁর খরচের বহর এক কালে। দানও ছিল স্বতঃ, অজচ্ছল,–কেউ তাঁর কাছে প্রার্থী হ'য়ে গিয়ে কখনও ফিরে আসেনি।

বিডন স্কোয়ারের সেই মিটিং এর পর সব অভ্যাসই তিনি ত্যাগ করেছিলেন। পরে নিজেই আমার কাছে বলেছিলেন– "মদ ত্যাগ ক'রে আমার কোন কষ্টই হয়নি, কিন্তু তামাক খাওয়া ত্যাগ ক'রে আমার যে কি কষ্ট হয়েছল তা বর্ণনা করতে পারি না। মেজাজ ভয়ানক খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। এক মাস পর্য্যন্ত কেউ আমার কাছে আসতেই সাহস পেত না। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হ'য়ে যায়।"

দেশবন্ধু নিজের পুত্র-পরিজনের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে নিজের বাড়িটা পর্য্যন্ত দেশের সেবায় দান ক'রে, বিশপ-লিফ্রয় রোডে একটা ফ্ল্যাটে উঠে এলেন। শরীর অসুস্থ থাকায়, তার কছুদিন পরেই স্বাস্থ্যোন্নতি–কামনায় তিনি পাটনায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা P. R. Das-এর বাড়িতে এলেন। তিনি পাটনায় এসেছেন শুনে আমি শ্রদ্ধেয় কেষ্টদাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য P.R. Das-এর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তিনি তখন পাটনা-হাইকোর্টের জজ, দেশবন্ধুর সাথে দেখা করতে যেয়ে তাঁর সঙ্গেও আলাপ হ'ল, আলোচনা হ'ল আশ্রম

ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে ।

দেশবন্ধু বললেন যে তিনি পাটনায় এসে অনেকটা ভাল বোধ করছেন ।

কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বোম্বের 'বাওলা হত্যা মোকর্দ্দমায়, আসামী পক্ষ আপনাকে দশ লাখ টাকা দিয়ে তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করবে শুনছি ।"

দেশবন্ধু–"একথা তো আমিও শুনেছি ।"

আমি–"যদি সত্যি তারা আপনাকে নিযুক্ত করে তবে কি আপনি তাদের case নিয়ে পুনরায় court-এ দাঁড়াবেন?"

...দেশবন্ধু–"তারা নিযুক্ত করলে case নেব ঠিক করেছি । টাকার কত প্রয়োজন তা এখন বেশ বুঝতে পারছি । বোম্বের 'পারেখ' আমাকে আমার পার্টির জন্য ৫ লাখ টাকা দিতে চেয়েছেন, আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি যদি সে টাকা পাই তাহলে আপনাদের আশ্রমের জন্য ৩ লাখ দেব আর ২লাখ আমার পার্টির জন্য থাকবে । .... আপনারা আশ্রমের কাজ ক'রে যাবেন । টাকার অভাব হবে না, আমি টাকা যোগাড় ক'রে দেব ।"

পাটনায় পি, আর, দাসের বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে আমি ও কেষ্টদা বেনারস অভিমুখে রওনা হ'য়ে গেলাম । উদ্দেশ্য ছিল বেনারস যেয়ে ড. অ্যানি বেসান্ত ও ড. ভগবান দাসের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে আলোচনা করা । অ্যানি বেসান্ত তখন কাশীতে ছিলেন না, ড. ভগবান দাসের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ক'রে আমরা দু'জনে কাশী থেকে আশ্রমে ফিরে আসি ।

এরপর দেশবন্ধুর সাথে পুনরায় দেখা হয় কলকাতায়, ফরিদপুর কনফারেন্সের পূর্বে । দেশবন্ধু ফরিদপুর আসছেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর দেশবন্ধুকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখে আমার হাতে দেন–

দেশবন্ধু, দাশদা আমার!"

অনেকদিন দেখিনি দাদা আপনাকে । মাঝে-মাঝে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে । দেখবার প্রলোভনটা থামিয়ে দিতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না । শুনলেম, আপনি ফরিদপুরে আসছেন । ফরিদপুর আর পাবনা বেশীদূর নয়কো । আপনার কি আমার কাছে আসতে খুব কষ্ট হবে দাশদা? আমার কিন্তু বড় ইচ্ছা করে গোটাকতক দিন আপনাকে নিয়ে স্ফূর্ত্তি করি । পরমপিতার দয়ায় তাতে বোধ হয় আপনার শরীর ভাল হবে । আপনি এলে সুশীলদারাও খুশী হবেন । সবাই খুশী হবে । এদের বহুকষ্টের প্রতিষ্ঠানগুলি ধন্য হবে দাদা! কত নিন্দা, কত কলঙ্ক, কত অনটন অপবাদের পাহাড় ঠেলে, অকৃতজ্ঞতার নদী সাঁতরিয়ে, এ-গুলি করেছেন এ'রা । আপনি এলে সার্থক হবে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে, বুকের আগুন চাপা দিয়ে কাজে লেগে যাবেন এঁরা বোধ হয় ।

মহাত্মাজীও নাকি বাংলা ভ্রমণে বেরুচ্ছেন তাঁকে এখানে আসবার অনুরোধ করব এমন সাহস নাই । আর কাহারও এখানে আছে কিনা জানি না । আপনার দয়া যদি তাঁকে আনতে পারে ।

আমি জানি দাদা, আপনার কাছে চিঠি লিখবারই নয়, তবে 'আপনিই' এই আমার সাহস । আর যেই হই বা যাই-ই হই, সবার গর্ব্ব আপনি । আমার তো নিতান্তই তাই, আমার আরো করে । শুনেছিলাম মাঝে শরীরটা আপনার একটু ভাল হয়েছিল । আবার জ্বর হয়েছিল । এখন কেমন আছেন দাদা? ভোম্বল ও আমার মায়েরা বোধ হয় পরমপিতার কৃপায় শারীরিক ভালই আছেন ।

আমার আন্তরিক 'রা জানবেন দাদা!

আপনারই দীন

"আমি"

শ্রীমান সুধীর মুখার্জ্জি ও আমি এই চিঠিখানি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধুর সাথে দেখা ক'রে তাঁকে দেই । তিনি মাথায় ছু'ইয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিঠিখানি গ্রহণ করলেন এবং প'ড়ে বললেন যে, ফরিদপুর কনফারেন্স থেকে ফিরে এসে দার্জ্জিলিং যাবার পথে আশ্রমে যাবেন । তাঁর সঙ্গে এও ঠিক হ'ল, যে ট্রেনে তিনি ফরিদপুর যাবেন সেই ট্রেনে সুধীর ও আমি তাঁর সঙ্গে ফরিদপুর যাব ।

নির্দিষ্ট দিনে দেশবন্ধুর সাথে আমরা দু'জনে ফরিদপুর রওনা হলাম । ফরিদপুর যেয়ে দেশবন্ধু যে বাড়িতে উঠলেন, আমরাও সেই বাড়িতে উঠলাম । সেই বাড়িতে উঠে হাতমুখ ধোবার পর দেশবন্ধু বাইরের ঘরে এসে বসলেন । আমার দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন–"দেখুন! যখন আমার নিজের বাড়ি ছিল তখন মনে করতাম মাত্র সেইটিই আমার বাড়ি । এখন আমার নিজের কোন বাড়ি নেই, যে বাড়িতেই যাই

সেইটাই আমার নিজের বাড়ী ব'লে বোধ হয় । ফরিদপুর এসে এই বাড়িতে উঠেছি, মনে হচ্ছে এইটাই আমার নিজের বাড়ি । এখন মনে হ'চ্ছে সারা বিশ্বই আমার গৃহ । পূর্ব্বেকার সেই ভাবটাই ভাল, না এখানকার এই ভাবটাই ভাল?"

আমি–"এখনকার এই ভাবটাই যে ভাল তার আর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ রিক্ত ক'রে এ-ভাব আস্বাদ করতে পারে এ-রকম লোক জগতে কয়জন আছে?

ফরিদপুর কনফারেন্স আরম্ভ হ'ল । মহাত্মাজীও সে কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন । ফরিদপুর কনফারেন্স দেশবন্ধুর ভাষণে যেন একটা নূতন সুর ঝঙ্কৃত হয়েছিল । তা' সকলকে মুগ্ধ করেছিল ।

অধিবেশন চলার সময়ে সুধীর গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়ল; তার কলেরা দেখা দিল । তাকে নিয়ে শ্রদ্ধেয় বিপিনদার বাইরের ঘরে এসে উঠলাম । বিপিনদা ছিলেন হোমিওপ্যাথ, তিনিই চিকিৎসা করতে লাগলেন । তার বাহ্য প্রস্রাব, কাপড়-চোপড় সব আমাকেই পরিষ্কার করতে হ'ত, সেবা পথ্যাদির জন্যও ব্যস্ত থাকতে হ'ত । কাজেই দেশবন্ধুর সাথে আর দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত না বা তাঁর সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাওয়াও সম্ভব হ'য়ে উঠল না । তাই ফরিদপুর থেকে শ্রদ্ধেয় কেষ্টদাকে পত্র লিখে জানালাম– দেশবন্ধুর সাথে আমার কলকাতায় যাওয়া হ'ল না, তিনি যেন নির্দিষ্ট দিনে কলকাতায় যেয়ে তাঁকে আশ্রমে নিয়ে যান । সুধীর একটু অসুস্থ হ'লেই আমি আশ্রমে রওনা হব ।

তাই আশ্রম থেকে কেষ্টদা কলকাতায় যেয়ে এসে পদ্মাতীরে একটা ছোট বাংলোতো উঠলেন । তাঁর বাংলোর সম্মুখে পদ্মাতীরে একটি বাঁধান বেদী ছিল । সেখানে বসে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে তিনি আলাপ-আলোচনা করতেন– আধ্যাত্মিক সাধনা, শিক্ষা, দর্শন, সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলোচনা হ'ত । দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এসে তিনি কি-কি কাজ করবেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে বসে সে-সব পরামর্শ করলেন । যে কুটীরখানিতে তিনি থাকতেন সেটা তিনি কিনে নেবেন এবং এখান থেকে একটা ইংরাজী সাপ্তাহিক কাগজ বের করবেন, এইসব স্থির হ'ল । সৎসঙ্গ ব্যাঙ্ক কি ক'রে আরম্ভ হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল, তিনিই ব্যাঙ্কের প্রথম director হবেন । সৎসঙ্গ থেকে পূর্ব্বে যে Commerce and Culture of India' নামে একটি কোম্পানি গঠিত হয়েছিল তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উক্ত কোম্পানির director গণের নিকটে নিজে পত্র লিখে পাঠালেন । আমাদের কাছে আরো বললেন–"দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এসে এবার এখানেই All India Congress Committee-র মিটিং ডাকবো । তাতে দেশের সব বরেণ্য নেতারা যোগ দেবেন । তাঁদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন এবং ভাবধারার কথা তুলে ধরব ।"

মহাত্মাজী তখন বাঙলা ভ্রমণে বের হয়েছেন । তাঁকেই বিশেষ ক'রে চিঠি লিখে দিলেন, আশ্রমটি একবার দেখে যাবার জন্য ।

আশ্রম থেকে দার্জিলিং রওনা হবার পূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন– আমি একজন বিশ্বস্ত personal-assistant খুঁজে পাচ্ছি না । আপনি যদি আপনার কর্ম্মীদের মধ্যে একজনকে দেন তবে ভাল হয় । তাঁর কথামত শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমের কর্ম্মী মনোহরচন্দ্র বসুকে তাঁর সঙ্গে দিলেন । তিনি দেশবন্ধুর সাথে দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের সময় পর্যন্ত ছিলেন ।

দেশবন্ধু আশ্রমে ৩/৪ দিন থাকার পরই অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলেন । তাঁর আশ্রম থেকে যাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনের তাগিদে তাঁকে দার্জ্জিলিং যেতে হ'ল । শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দার্জ্জিলিং যাওয়া দুই বারের মত স্থগিত করলেন বটে কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পরে যেতে অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর যাবার সময় বললেন– যেতে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু কি করবো, উপায় নেই ।

তিনি ও বাসন্তী দেবী রওনা হ'লেন মনোহরদাকে সঙ্গে নিয়ে, আমি তাঁদের মোটরে ক'রে ঈশ্বরদী স্টেশনে উঠিয়ে দিতে গেলাম । পুত্র চিররঞ্জন, পুত্রবধূ সুজাতা দেবী ও তাঁর কন্যাগণ আশ্রমে র'য়ে গেলেন । মোটরে বসে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলতে লাগলেন । বলতে-বলতে বললেন– আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই–আমার জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাধারা, যা' এতদিন আবছার মত ছিল, তা' শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ পেয়ে স্ফুটতর হ'য়ে উঠেছে আমার কাছে । আমি শুধু ভাবি আর আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই যে কি ক'রে একজনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা, এ-রকমে আর একজনের সঙ্গে মিলে যেতে পারে । দু'টো শরীর আলাদা কিন্তু মনের এ-রকম অপূর্ব্ব মিল কি ক'রে হয়–তা বুঝি না!

চিরঞ্জীব বনৌষধি

(১ম খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য

সপ্তপর্ণী (ছাতিম)

আমরা কখনও কখনও তিরস্কার ক'রে বলি "তোমার ণত্ব ষত্ব জ্ঞান লোপ পেয়েছে", এটা সাধারণতঃ টোলের পণ্ডিত মহাশয়দের কাছ থেকেই, কারণ শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে ন, ণ ও শ, ষ, স কোন্ শব্দে কোন্‌টি ব'সবে এ কথাটা বৈয়াকরণিকের এক্তিয়ারে, অর্থাৎ কিছুটা ব্যাকরণের সূত্র জ্ঞান থাকা চাই, তা'ই ঠিক মত না ব'সলেই তাঁরা বাক্য-বিন্যাসের বিপর্যয় দেখেন; এই যেমন শঙ্কর, সঙ্কর দুটি শব্দের শ্রুতিসাম্য থাকলেও আপনার মনও কলম দ্বিধাগ্রস্থ হবে শব্দের আদি অক্ষর বসাবার সময়, আর পাঠকের কাছে হবে ধ্যান-ধরণারও ফারাক ।

এই শঙ্কর শব্দটির ভাব নিয়ে, তাকে বিশেষণ করে সাঙ্করী, তারপর এই সঙ্কর শব্দটির ভাবার্থ নিয়ে দুটি মিলনের দ্যোতক–যেমন বর্ণসঙ্কর, ঋতুসঙ্কর, প্রাণীসঙ্কর ও রোগসঙ্কর । এই সঙ্কর ক্ষেত্রটাই বড়–দুই-এর স্বভাব বর্তায় কি চরিত্রে কি কালে কি জন্মসূত্রে, তাই প্রাণীজগতের একটি সঙ্কর জীবকে আমরা উপমার ক্ষেত্রে কথায় কথায় হাজির করি আমাদের দৈনন্দিন চলাফেরার সময় ।

এই বনৌষধিটির চারিত্রিক ক্ষেত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত আছে, তাই এই নিবন্ধোক্ত শিরোনামে সাঙ্করী বিশেষণটা দেওয়া হলো ।

বক্তব্যের অন্তরালে

অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ১৬৭/৩/২২ সূক্তে ধ্বনিত হ'য়েছে–

যস্তে রসঃ সম্ভৃতঃ ওষধীষু শুম্মঃ সপ্তচ্ছদ মদেন
ঋতুজ্ঞা স্তে নো অবন্তু ঋতুথেন্দ্রো বনস্পতিঃ ।

এই সূক্তের মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন–

সপ্তপর্ণং সপ্তচ্ছদং অধিকৃত্য ব্যাকুর্ব্বন্তি ঋতুজ্ঞা অশ্বিনৌ চ তে রসঃ য সম্ভূতঃ ভবতি ওষধীষু সপ্তচ্ছদঃ তস্য মদেন=রসেন ঋতুজ্ঞাঃ নো অবন্তু=রক্ষন্তু, ঋতুথা=প্রতি প্রতি ঋতুং বনস্পতির্হি ইন্দ্রোহিত্বম্ ।

এই সূক্তটি সন্তপর্ণ বা সপ্তচ্ছদকে অধিকার ক'রে ভিষক্ অশ্বিনীযুগল এবং ঋতুজ্ঞগণ সপ্তচ্ছদের রস সংগ্রহ করেন, এটি সম্ভৃত হলে সেই রসের দ্বারা আমরা ঋতুগত রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবো, ইন্দ্র যেমন সকলের মাননীয়, বনস্পতি সপ্তচ্ছদও আমাদের মাননীয় রক্ষক ।

বৈদ্যকের নথি

বৈদিক তথ্যে লিখিত "সম্ভৃত" শব্দটিতে দুটি ইঙ্গিত বহন করে–একটি হ'লো বৃক্ষ-ত্বকে তার গুণ, বীর্য সংহত হওয়া আর দ্বিতীয় অর্থ করা যায় ঋতুজ্ঞগণ কর্তৃক সেটিকে সংগৃহিত করা । প্রথমোক্ত বক্তব্যটি এখানকার বক্তব্য বলে মনে করা যায় ।

বৈদ্যকের সিঁদকাঠি প্রবেশ ক'রেছে এই বৈদিক সূক্তটির মধ্যে; কিন্তু আপাতঃ চিন্তায় আসে না যে এর মধ্যে ওষধীয় কোন বিশেষ ইঙ্গিত আছে, তা সত্ত্বেও সুপ্রাচীন ঋষি বৈদ্যগণ এরই মধ্য থেকে বৈদ্যক বিদ্যার সূত্র খুঁজে পেয়েছেন । তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদ্যক সংহিতা গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ চরক সংহিতায়, সেটা আছে বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে, তিক্তক স্কন্ধে, শিরোবিরেচনের দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে এবং সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ের উদর্দ ও কুষ্ঠের প্রশমনে, তাছাড়া সিদ্ধি ও কল্পস্থানে বমনোপগের ভেষজ কল্পনায় । এটা কেবল চরকে কেন, সুশ্রুতে, তাৎকালিক অন্যান্য সংহিতাগ্রন্থেও আছে । স্পেশাল বেঞ্চের জুরিগণ যেমন সাত দিনের সাওয়ালের মধ্যে দুই-একটা কথার সূত্র খুঁজে বের করেন, সেই রকম সপ্তপর্ণের প্রসঙ্গটি । বৈদিকসূক্ত থেকে ঋষি বৈদ্যগণ যে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন– সেটি হ'লো ঋতু বিবর্তনের ওলটপালটে প্রকৃতিবিকার-জনিত আয়ুর্বিনাশী রোগ প্রতিষেধ ও প্রতিরোধের অন্তর্নিহিত শক্তি র'য়েছে এই বৃক্ষটির মধ্যে ।

কালাকাল প্রসঙ্গ

বর্ষ সংক্রমণে প্রধানভাবে তিনটি ঋতুরই মুখ্য অস্তিত্ব আমাদের কাছে জাগ্রত । শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এরাই মুখ্য ঋতু,

আর এদের আসা-যাওয়ার মাঝখানে যাদের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করি, তারা হ'লো প্রাবৃট্, শরৎ আর বসন্তকাল এই সংজ্ঞায়।

কিন্তু এই তিনটিই সঙ্কর ঋতু। এই সময়ে প্রকৃতিও বিকারগ্রস্তা, সেই বিকারে আমাদেরও প্রভাবিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই যেমন সকালে গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা, তারও আসা-যাওয়ার মাঝখানে প্রকৃতিবিকারের অসমতা, যাকে বলা যায় বিকৃতি-বিকার। এ যেন ভেজালেরও ভেজাল। আমাদের শরীর ঐ বিকৃতি-বিকারজনিত রোগেই দুষ্ট হয়ে থাকে। কালজ রোগের প্রকৃতিটি কিন্তু এমন গুরুতর হয় না, অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যে রোগ জন্মে সেইটাকেই বলা হয় কালজ রোগ। এই সব কালজ রোগের প্রাবল্য ঋতুর অবসানে হ্রাস পায়। কিন্তু ঋতু সঙ্করের (প্রাবৃট্, শরৎ ও বসন্তকালের) রোগগুলি একটু গোলমেলে হয়ে থাকে; অথ র্ৎ বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন দোষের সঙ্করবিকার হয়; এই যেমন, এই সময় হয়তো জ্বর হলো, দেখা গেল তার সঙ্গে অতিসার (পেটের দোষ) এসে জুটলো, তাই তাকে সামলাতে চিকিৎসকও হিমসিম, আর রোগীও আধমরা।

প্রথমে বলে রাখি এই সপ্তপর্ণ ত্বক্ (ছাল) তিক্ত কষায় রস। এই তিক্ত রসের ভৌতিক উপাদান বায়ু ও আকাশের প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্ট। পাঞ্চভৌতিক এই দুই মৌল উপাদান কফের (পাঞ্চভৌতিক অপ্ ও ক্ষিতি) বিপরীতধর্মী, অর্থাৎ যাকে বলা যায় ওলে যেমন তেঁতুল। তাই বিকারগ্রস্ত কফের দ্বারা সৃষ্ট রোগ ক্লেদাত্মক হ'লেও সে তো কাজ করেই, তারপর সেটাতে যদি কোন ব্যাক্টিরিয়া বা কীট সৃষ্টি হয়, (এটা কিন্তু সেই বিকৃতিজনিতবিকার ক্ষেত্র) কারণ প্রথমে ক্লেদ, তারপরে সৃষ্ট হয় কীট, সেইখানেই তার অমোঘ কাজ, আবার তার সঙ্গে ওর রসে কষায় ধর্মিত্ব আছে বলেই, সে সঙ্কোচক, কারণ কষায় রসের মৌল উপাদান হলো পৃথ্বী ও বায়ু এই দুই ভৌতিক উপাদান। এই গেল তার প্রকৃতিগত গুণ বিচার।

বৃক্ষ পরিচিতি

বৃহৎ ও চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত গাছগুলি ৪০/৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছের পুরু ছালের ভিতরটা সাদা ও দানাযুক্ত কিন্তু উপরটা খসখসে, গাছের সমগ্রাংশে সাদা দুধের মত আঠা (ক্ষীর) আছে, পাতাগুলির আকার অনেকটা মনসা পাতার মত। যার সংস্কৃত নাম স্নুহী, বোটানিকাল্ নাম Euphorbia nerifolia. প্রায় সব শাখারই অগ্রভাগ ছত্রাকার ও ৭টি পাতা সাজানো থাকে ; আবার কোন কোন শাখাগ্রে ৫/৭/৮টি পাতাও দেখা যায়, তবে সেটা খুবই কম, তাই এই গাছটির একটি নাম 'সপ্তচ্ছদ'। চ্ছদ অর্থে পত্র (পাতা) অথবা 'সপ্তপর্ণা' বা 'সপ্তপর্ণী', হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে একে বলা হয় ছাতিয়ান বা ছাতিবন্, আর বাংলার চলিত নাম ছাতিম। বিশ্বজন এই নামটির সঙ্গে সুপরিচিত। তার প্রধান কারণ বিশ্ববরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর প্রমাণপত্রের প্রতীক স্বরূপ দেওয়া হয় এই সপ্তপর্ণীর পত্র।

এই গাছ জন্মে সমগ্র বাংলা, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতেও। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে সরু বরবটীর শিম্বির মত ফল হয়। এর ফুলের উৎকৃষ্ট গন্ধ থাকলেও সেটি তীব্র। এই গাছটির বোটানিকাল্ নাম– Alstonia Scholaris R. Br., ফ্যামিলি Apocynaceae. ঔষধার্থে ব্যবহার হয়–ত্বক্ (ছাল), পাতা, ফুল ও ক্ষীর (আঠা)। মাত্র– ছালচূর্ণ দেড় থেকে দু'গ্রাম, ফুলচূর্ণ আধ গ্রাম থেকে দু'গ্রাম, ক্ষীর সিকি গ্রাম থেকে আধ গ্রাম।

রোগ প্রতিকারে

এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ ও রক্তবহ স্রোতের উপর।

১। কুষ্ঠেঃ– কোন জায়গায় লাল বা কালো দাগ দেখা দিচ্ছে, সে জায়গাটা একটু উঁচু এবং অসাড়তা আসছে, সে ক্ষেত্রে ছাতিম ছালচূর্ণ এক গ্রাম মাত্রায় ১ চা–চামচ গুলঞ্চের রস মিশিয়ে খাওয়া, আর ১০/১২ গ্রাম ছাল ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, সেঁকে ঐ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা। অথবা ৪০/৪৫ গ্রাম ছালকে থেঁতো ক'রে আধ সের জলে খানিকসময় সিদ্ধ ক'রে, সেঁকে সেই জল স্নানের জলে মিশিয়ে স্নান করা। এটি চরক সংহিতার ব্যবস্থা।

২। জ্বরে (পুরানো)ঃ– জ্বর প্রায় মাঝে মাঝে হচ্ছে, মুখে অরুচি, দান্ত পরিস্কার হয় না, যকৃত প্লীহায় ব্যথা, আস্তে আস্তে চেহারা ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে ১০/১২ গ্রাম ছাতিম ছাল ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে (শুষ্ক হ'লে ৫/৬ গ্রাম), ছেঁকে নিয়ে সেই জলটা দু'বেলায় ভাগ করে খেতে হয়, এর দ্বারা দুই-এক দিনের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে যাবে। এর সঙ্গে নাটা করঞ্চের (Caesalpinia bonduaella) বীজের শাঁস ২ বা ৩ গ্রেণ (১৫০–২০০ মিলি গ্রাম) মাত্রায় ঐ ক্বাথের সঙ্গে খেয়ে থাকেন।

৩ । সান্দ্রমেহেঃ– প্রস্রাবের সঙ্গে কফের মত ধাতু বেরোয় এবং চেহারাটা ঢিলে-ঢালা হয়, তঁরাই সান্দ্রমেহ রোগগ্রস্থ । এক্ষেত্রে ছাতিমছাল ৫ থেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, ঈষদুষ্ণ দুধে মিশিয়ে (দুধ সিকি কাপ) দুইবারে ঐ ক্বাথটা খেতে হয় । অবশ্য বলে রাখা ভাল যে, যাঁদের অগ্নিবল কমে গিয়েছে অর্থাৎ হজমশক্তি ক'মে গিয়েছে, তাঁরা এই যোগটি ব্যবহার করবেন না ।

৪ । হিক্কাশ্বাসেঃ– (পিত্তানুগত হিক্কাশ্বাসে) এক্ষেত্রে কফের আধিক্য থাকবেই, তিন্তু পিত্তের লক্ষণও থাকবে, সেক্ষেত্রে ছাতিম ছালের রস আধ চা-চামচ (৩০/৪০ ফোঁটা) সিকি কাপ দুধে মিশিয়ে (৭/৮ চা-চামচের কম না হয়) খেতে হয় । ছাল কাঁচা সংগ্রহ না হলে ছালচূর্ণ দেড়/দুই গ্রাম দুধ ও পিপুল চূর্ণ মধু মিলিয়ে খেতে হয় । পিপুল চূর্ণ ২/৩ রতি (১৫০–২০০ মিলিগ্রাম) নিলেই হবে ।

৫ । দন্তক্রিমিতেঃ– দাঁতের পোকার যন্ত্রণায় ছাতিমের আঠা (ক্ষীর) ঐ পোকা-লাগা দাঁতের ছিদ্রে দিয়ে দিতে হবে । এগুলি আয়ুর্বেদের প্রাচীনগ্রন্থ বাগ্ভটে বলা আছে ।

৬ । হাঁপানিতেঃ– (শ্বাসকাসে) যেখানে দেখা যাচ্ছে বিশেষ সর্দির প্রকোপ নেই অথচ হাঁপের টান বেশী, সেখানে ছাতিমের ফুল চূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম, তার সঙ্গে পিপুল চূর্ণ ৩/৪ গ্রেণ (২০০/২৫০ মিলিগ্রাম) মাত্রায় মিশিয়ে দই-এর মাতের সঙ্গে খেতে হয় । এটা সুশ্রুতের উত্তরতরন্ত্রর ব্যবস্থা ।

৭ । স্তন্যদুগ্ধের স্বল্পতায়ঃ– বুকের দুধ ক'মে গিয়েছে, অথবা ভাল হয় নি, সেক্ষেত্রে ৫/৬ গ্রাম ছাতিম ছাল থেঁতো ক'রে, ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, সেই জলের সঙ্গে আধ কাপ দুধ মিশিয়ে খেতে হয় । এর দ্বারা বুকের দুধ বেড়ে যায় । এভিন্ন স্তনের দুধ আঠার মত হ'লে এই ক্বাথে জল মিশিয়ে খেলে ঐ দোষটা নষ্ট হবে ।

৮ । গাঁটের ব্যথায়ঃ– বাতের জন্য যাঁদেও ব্যথা হয়, তাঁরা ৭/৮ গ্রাম ছালকে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ কওে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, ঐ ক্বাথটা খাবেন, এর দ্বারা ঐ ব্যথার উপশম হবে ।

৯ । সর্দি বসায়ঃ– বুকে শ্লেষ্মা বসে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে দুধে জল মিশিয়ে সেই দুধজল ১ গ্রাম ছাতিমছাল চূর্ণ দিয়ে অল্প খানিকক্ষণ ফুটিয়ে সেইটা খেতে হবে অথবা ঐ চূর্ণ ঐ ঈষদুষ্ণ জল মিশানো দুধ দিয়ে খেতে হবে । এর দ্বারা বুকের সর্দিটা সরল হ'য়ে উঠে যাবে ।

১০ । অগ্নিমান্দ্যেঃ– আমপ্রধান অগ্নিমান্দ্যে যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা ছাতিমছাল অথবা ফুল চূর্ণ আধ গ্রাম (৫০০ মিলিগ্রাম) মাত্রায় ঈষ্ণদুষ্ণ জল সহ দু'বেলা খাবেন ।

১১ । শ্বাসকষ্টেঃ– শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে (হাঁপানিজনিত), ছাতিম ফুল চূর্ণ (মিহি) আধ কাপ বা ১ গ্রাম মাত্রায় ২/৩ গ্রেণ (২০০ মিলিগ্রাম) লবণ মিশিয়ে অল্প গরম জল সহ খেতে হয়, এর দ্বারা শ্বাসকষ্টের উপশম হয় ।

১২ । রক্তগুল্মেঃ– গর্ভেও সব লক্ষণ, কেবল বুকে দুধ আসে না, আর পেটে কুন্কুন্ ক'ওে ব্যথা ধওে, এটা গুল্মেও লক্ষণ, এক্ষেত্রে কয়েক'দিন দু'বেলা ২/৩ গ্রাম মাত্রায় খেতে হয়, এর দ্বারা ঐ রক্তগুল্মটা ভেঙ্গে গিয়ে স্রাব হ'য়ে যাবে, অথচ যন্ত্রণা হবে না, আর বায়ু জন্য গুল্ম হ'লে সেটা কয়েকদিনেই চুপসে যাবে ।

১৩ । দুষ্ট ব্রণেঃ– যে ব্রণের ক্ষত কিছুতেই পুওে উঠতে চায় না, সে ক্ষেত্রে ছাতিমের আঠা (ক্ষীর) শুকিয়ে গঁড়ো ক'রে ক্ষতের উপর ছিটিয়ে দিলে ওটা পুরো ওঠে ।

১৪ । পাইয়োরিয়ায়ঃ– ছাতিমের আঠা ৫/১০ ফোঁটা গরম জলে মিশিয়ে সেই জলে গার্গেল্ () করলে, যদি সম্ভব হয় ২/৫ মিনিট ঐ জলটা মুখে পুরে রেখে তারপর ফেলে দিতে হয়– এইভাবে একদিন অন্তর এই প্রক্রিয়াটা ক'রলে পাইয়োরিয়া সেরে যায় ।

সর্বশেষে জানাই যে, দেহের গঠন সাতটি ধাতুতে (রস, রক্ত,মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র) আর এই বৃক্ষটি যেন সপ্ত সংখ্যার প্রতীকরূপে সাতটি চ্ছদ অর্থাৎ পত্র তাকে ছাউনি দিয়ে রাখে, না সাত দিকের ছদ্ অর্থাৎ ছাউনি দিয়ে তাকে রক্ষে ক'রে আছে?

মার্জনা-পত্র

বিগত ভাদ্র/১৪২৩ সংখ্যায় অনাকাঙ্ক্ষিত কয়েকটি সৎসঙ্গ সমাচার ভুলবশতঃ প্রকাশিত হয়েছে । বিষয়টি একেবারেই ভুলক্রমে ঘটেছে । সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে এজাতীয় ত্রুটির জন্য সবিনয় ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করছি ।

প্রার্থনার সময়সূচি

(বাংলাদেশ সময়ানুসারে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সূর্যোদয়ের ৩০ মিনিট পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সূর্যাস্তের সাথে সাথে)

মাসের নাম	তারিখ / সময়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫			
	সন্ধ্যা	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪			
মার্চ	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫
	সন্ধ্যা	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৭
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৪	৫.১৩	৫.১২	৫.১২	৫.১১	৫.১০	৫.১০	৫.০৯	
	সন্ধ্যা	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৯	
মে	প্রাতঃ	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৩	৫.০৩	৫.০২	৫.০২	৫.০১	৫.০০	৫.০০	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫
	সন্ধ্যা	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৩
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	
	সন্ধ্যা	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	
জুলাই	প্রাতঃ	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০১	৫.০১	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৯
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৭
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.০৯	৫.১০	৫.১০	৫.১১	৫.১১	৫.১২	৫.১২	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০
	সন্ধ্যা	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৯	৬.৩৮	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩১	৬.৩০	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৫	৬.২৪
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০	
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
	সন্ধ্যা	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	
	সন্ধ্যা	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২২	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.২০	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭

প্রস্তুতকারক ঃ শ্রীঅসিতকুমার মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক), সহযোগিতায় ঃ শ্রীঅরবিন্দকুমার মণ্ডল (যাজক), সাতক্ষীরা ।